# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬০ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ২ - ৮ মে ২০০৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠা দিবসে পার্টির সন্টলেক কমিউনে কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে লাল সেলাম জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী। এদিন কমরেড শিবদাস ঘোষের নির্বাচিত রচনাবলীর (বাংলা) তৃতীয় খণ্ড তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন।

## মহান মে দিবসের আহ্বান

১৮৮৬ সালে মে দিবসের সংগ্রামের ১২২ বছর পরও বিশ্বজোড়া শ্রমিকশ্রেণীর সামনে ১ মে হল মুক্তি সংগ্রামের শপথ নেওয়ার দিন। বিশেষত বর্তমানে, তথাকথিত বিশ্বায়নের তাত্ত্বিক মোড়কে পরিবেশিত 'মুক্ত অর্থনীতির' আওতায় শ্রমিকশ্রেণীর বহু সংগ্রামলব্ধ অধিকারগুলি যখন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, সরকারি মদতে মালিকের জুলুম যখন ক্রমাগত অবাধ করা হচ্ছে, ৮ ঘণ্টার শ্রমদিবস ও ৪০ ঘণ্টার শ্রমসপ্তাহকে যখন ইতিহাসের বিষয়ে পরিণত করার চেষ্টা চলছে, মালিকের কাছে শ্রমিকের ক্রীতদাসত্বকে যখন কর্মসংস্কৃতি বলে প্রচার করা হচ্ছে, সেই সময়ে মে দিবস শ্রমিকশ্রেণীর কাছে সংগ্রামী সামাজিক ভূমিকা পালনের আহ্বান জানায়। মে দিবসের সংগ্রামে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের সামনে মার্কসবাদের আলোকবর্তিকা ছিল না। তাঁরা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শোষণের কুফল থেকে মানবসমাজকে মুক্ত করার মানবিক আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে পারি কমিউনের সংগ্রামের ধারাবাহিকতায়।

সেই সংগ্রামকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার বিজ্ঞানসম্মত পথের সন্ধান দেন কার্ল মার্কস। ''কাজ অনুযায়ী মজুরি, এই পুরনো স্লোগান নয়, মজুরিদাসত্বের অবসান চাই— এই বিপ্লবী বার্তাই ঘোষিত হোক শ্রমিকশ্রেণীর পতাকায়'' — নতুন এই বিজ্ঞানসম্মত

দুয়ের পাতায় দেখুন

## পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমকে পরাস্ত করে
# এস ইউ সি আই ও তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ী করুন

### প্রেস ক্লাবে 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে কমরেড প্রভাস ঘোষ

পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রসঙ্গে এস ইউ সি আইয়ের বক্তব্য সাংবাদিকদের সামনে রাখার জন্য ২৮ এপ্রিল কলকাতা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে কমরেড প্রভাস ঘোষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রেস ক্লাবের সভাপতি শ্রী কমল ভট্টাচার্য ও সম্পাদক শ্রী কুশল দাশগুপ্ত পুষ্পস্তবক দিয়ে কমরেড প্রভাস ঘোষকে অভিনন্দন জানান। কমরেড প্রভাস ঘোষ তাঁকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রেস ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে এরপর তিনি বলেন,

আমরা এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদে ৬৩টি আসনে, সমিতিতে ৪২৭ টি, গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৭৭৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি জায়গায় কাজ করছি এবং যতটা আমাদের সাংগঠনিক শক্তি তাতে পলিটিক্যাল ফাইট দেওয়ার অর্থে আমরা রাজ্যের অন্তত ৪০-৪৫ শতাংশ আসনে একক শক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতাম। ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচন, ২০০৪ সালের লোকসভা এবং ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচন— প্রতিবারই প্রবল মেরুকরণের মধ্যেও আমাদের ভোট প্রায় ৪০% হারে বেড়েছে। ইতিমধ্যে আমরা মনে করি আমাদের সমর্থন আরও অনেক বেড়েছে। তবুও আমরা কম আসনে লড়ছি, কারণ আমরা চেষ্টা করেছি যাতে পশ্চিমবাংলার জনগণের আকাংখা অনুযায়ী সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ পঞ্চায়েত নির্বাচনে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিফলিত হয়। আপনারা জানেন, সম্প্রতি গণআন্দোলনের প্রয়োজনে তৃণমূলের সাথে আমাদের একটা যুক্ত উদ্যোগের সূচনা হয়েছে, যেটা এই রাজ্যে প্রথম। আমাদের দলের তরফ থেকেই আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছিলাম। মার্চ এবং নভেম্বরে নন্দীগ্রামে সিপিএমের যে নৃশংস আক্রমণ হয়েছে, তার চরিত্রকে আমরা ফ্যাসিস্টিক হিসাবে চিহ্নিত করেছি এবং আমাদের দল এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, আগামী দিনে যেখানেই শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলন হবে, সেখানেই এর চেয়েও ভয়ঙ্কর আক্রমণ হবে এবং তাকে মোকাবিলা করে আন্দোলনকে রক্ষা করতে হলে এই ধরনের ঐক্যের প্রয়োজন আছে। রাজ্যবাসী জানেন, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে এককভাবে আমরা কেউই এই ধরনের আন্দোলন গড়ে তুলতে পারতাম না। মার্কসবাদী বিপ্লবী দল হিসাবে পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা সবসময়ই শ্রেণী সংগ্রাম এবং গণআন্দোলনে গুরুত্ব দিয়ে লড়াই করে থাকি। অন্যদিকে, এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পার্লামেন্টারি রাজনীতির লক্ষ্য থেকে আন্দোলন করে যাচ্ছে। এই দুটি শক্তিকে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করেছিলাম। সেই সময় আমরা তৃণমূলকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, নির্বাচনের আগে রাজ্যের সর্বত্র নন্দীগ্রাম ঢঙে গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যাতে পঞ্চায়ত নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করা যায়। আমাদের লক্ষ্য সিপিএমের এই ফ্যাসিস্টিক অ্যাটিচুডকে একটা ধাক্কা দেওয়া। আবার, জাতীয় বুর্জোয়া পার্টি কংগ্রেস ও বিজেপি, সিপিএম বিরোধিতার স্লোগানে মানুষকে বিভ্রান্ত করে জায়গা করার যে চেষ্টা চালাচ্ছে, সেটাকেও খানিকটা প্রতিহত করা আমাদের লক্ষ্য ছিল। তৃণমূলের তরফ থেকে আমাদের বলা হয়েছিল, এত অল্প সময়ের মধ্যে গণকমিটি গঠন করা সম্ভব নয়, তাঁরা পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর গণকমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনে আসবেন। এ রকম কথাবার্তা আমাদের সঙ্গে হয়েছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাদের সঙ্গে আমাদের সার্বিক জোট না হলেও কিছু কিছু আসন সমঝোতা হয়েছে। আসন সমঝোতা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে করতে দেখেছি, রাজ্যস্তরে যেসব আসন তাঁরা কমিট করেছেন জেলা স্তরে কোথাও কোথাও সেখানে তৃণমূলের প্রার্থী দাঁড়িয়ে গেছেন। রাজ্য স্তরে যখন আমরা এগুলি বলেছি তখন তাঁরা বলেন যে, জেলাস্তরে তাঁরা সবটা মানাতে পারছেন না, যেখানে ঐক্য সম্ভব হচ্ছে না সেখানে আমরা যেন ফ্রেন্ডলি কনটেস্টে যাই। আমরা তাঁদের বলি, যেহেতু আগামী দিনে আমরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে যাব, এই ব্যাকগ্রাউন্ডে ফ্রেন্ডলি কনটেস্ট করা আমাদের পলিটিক্যাল কালচারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং তাতে জনগণ বিভ্রান্ত হবে, সিপিএম ফয়দা তুলবে। সেই জন্য কয়েক দফায় আলোচনা করার পর, এমনকী শেষ দিকে তাঁরা রাজ্যস্তরে বসে যেসব আসনগুলিতে ঐক্য হবে বলে কথা দিয়েছিলেন, তেমনও কিছু কিছু জায়গায় তৃণমূল প্রার্থী দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর আমরা ঘোষণা করে সেগুলি থেকে প্রার্থী তুলে

তিনের পাতায় দেখুন

# ২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠা দিবসে জেলায় জেলায় সভা

২৪ এপ্রিল কলকাতার এসপ্লানেড মেট্রো স্টেশনের সামনে সভায় বক্তব্য রাখছেন রাজ্যসম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু।

২৪শে এপ্রিল এস ইউ সি আই-এর ৬০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে দলের সন্টলেক কমিউনে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী। কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন ও কমরেড শিবদাস ঘোষের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য এবার কেন্দ্রীয়ভাবে কোনও সমাবেশের আয়োজন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জেলায় জেলায় কোথাও কেন্দ্রীয়ভাবে, কোথাও অঞ্চলে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে অসংখ্য সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

**কলকাতা**

কলকাতা জেলা কমিটির ডাকে এদিন এসপ্ল্যানেডের মেট্রো চ্যানেলে সভা অনুষ্ঠিত হয়। কোনও সংগঠিত মিছিল ছাড়াই মেট্রো

সাতের পাতায় দেখুন

# মূল্যবৃদ্ধির সরকারি হিসাবের চালাকি

বাজারে চাল, ডাল, তেল সবকিছুর দাম যখন ১০ থেকে ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ছে তখন কেন্দ্রের সরকারি হিসাবের ম্যাজিকে মুদ্রাস্ফীতির হার ৭ শতাংশের আসেপাশে চলছে। কী সেই হিসাবের ম্যাজিক তা দেখা যাক। মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধি অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকে সমার্থক না হলেও বাস্তবে দুটিকে একই ধরে নেওয়া হয় এবং মুদ্রাস্ফীতির হারকেই মূল্যবৃদ্ধির সূচক হিসাবে ধরা হয়ে থাকে।

মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয়ের জন্য জটিল একটা গাণিতিক প্রক্রিয়া নেওয়া হয়। সহজ কথায় বলা যায় গরিব ও মধ্যবিত্তরা যেসব খাতে বেশি ব্যয় করে, মুদ্রাস্ফীতির হিসাব করার সময় তাকে ততখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ভারতবর্ষে মুদ্রাস্ফীতির হার হিসাব করার জন্য প্রথমে, যেসব জিনিসের দামকে হিসাবে নেওয়া হবে তার একটা বাস্কেট তৈরি করা হয়। বর্তমানে ৪৩৫ টি পণ্যের বাস্কেট তৈরি করে সেগুলির দাম কতটা বাড়ছে, তা দ্বিতীয় একটা জটিল অঙ্ক কষে দেখা হয়। বাস্কেট তৈরি থেকেই কারচুপির শুরু। যেমন বর্তমানে যে ৪৩৫টি পণ্যের বাস্কেট তৈরি করা হয়েছে, তাতে হাঁসমুরগির খাদ্যকে হিসাবে নিলেও, বাদ দেওয়া হয়েছে শিক্ষার খরচ, ডাক্তারের খরচ এবং ঘরবাড়ির ভাড়া। হাঁসমুরগির খাদ্যের দামবৃদ্ধি গ্রামাঞ্চলের মানুষদের কাছে সমস্যা হলেও শহরে হাঁসমুরগি পালনের সুযোগ কম। আবার শিক্ষার খরচে যখন গরিব ও মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস উঠছে, পরিবারে কাউকে ডাক্তার দেখানোর কথা বহু গরিব যখন চিন্তাই করতে পারেন না, তাদের হাতুড়ে ডাক্তার দেখিয়ে বা আদৌ চিকিৎসা না করিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়; শহরাঞ্চলে বস্তিতে যেখানে একখানা ঘরের জন্য কমপক্ষে ৫০০ টাকা ভাড়া দিতে হয়, সেখানে মূল্যবৃদ্ধির হিসাব থেকে এগুলিকে বাদ দিলে সেই হিসাব কী করে বাস্তবকে প্রতিফলিত করে, তা একমাত্র সরকারই বলতে পারে।

এবার আসা যাক খাদ্যদ্রব্যের হিসাবের কথায়। সকলেই জানেন মানুষ যত গরিব, ততই তার আয়ের বেশিরভাগটাই চলে যায় খাদ্যদ্রব্য কিনতে। শিক্ষা, চিকিৎসা বা অন্যান্য ব্যাপারে খরচ করার কথা গরিব মানুষ ভাবতেই পারে না। মধ্যবিত্তদেরও একটা বড় অংশের আয়ের বেশির ভাগটাই চলে যায় খাদ্যদ্রব্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনতে ও ঘরভাড়া দিতে। অথচ মুদ্রাস্ফীতির বাস্কেটে খাদ্যদ্রব্যের দামবৃদ্ধিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ১৯৯৩-৯৪-কে ভিত্তি বর্ষ করে, ধরে নেওয়া হয় খাদ্য সহ অত্যাবশ্যক দ্রব্য ও খনিজ পদার্থ, পরিভাষায় যেগুলিকে প্রাইমারি আর্টিকেল বলে, সেগুলি কিনতে মানুষ তার মোট আয়ের ২২ শতাংশ মাত্র খরচ করে, অথচ বাস্তবে গরিব ও মধ্যবিত্তদের আয়ের গড়ে ৬০ শতাংশ খরচ হয় অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র কিনতে। অর্থাৎ একটা পরিবারের আয় যদি ৮০০০ টাকা ধরা হয়, তাহলে তাদের ৪৮০০ টাকা খরচ হবে প্রাথমিক প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে। যদি সেসব জিনিসের দাম ১০ শতাংশ বাড়ে তবে পরিবারটিকে সেজন্য বাড়তি খরচ করতে হবে ৪৮০ টাকা, মোট খরচ দাঁড়াবে ৫২৮০ টাকা। কিন্তু সরকারি হিসাবে বাড়তি ১০ শতাংশের অর্থাৎ ৪৮০ টাকার ২২ শতাংশকে হিসাবে নেওয়া হবে। ধরা হবে, অপরিহার্য দ্রব্যগুলির দাম বাড়ার জন্য পরিবারটিকে ১০৫ টাকা ৬০ পয়সা বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে। অর্থাৎ ৪৮০০ টাকা দিয়ে যা কেনা যেত, তা কিনতে এখন ৫২৮০ টাকা দিতে হলেও সরকারি হিসাবে ধরা হবে ৪৯০৫.৬০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। তাতে মূল্যবৃদ্ধির হারটা যে কমে যাবে তা বলাই বাহুল্য। তার ওপর আবার দানাশস্য অর্থাৎ চাল, ডাল, গম ইত্যাদির ক্ষেত্রে, ধরা হয়, মানুষ তার আয়ের মাত্র ৫.০১ শতাংশ ব্যয় করে। ফলে বাজারে দাম বৃদ্ধির যে আঘাতটা সাধারণ মানুষের ওপর পড়ে মুদ্রাস্ফীতির সরকারি হিসাবে তার প্রতিফলন দেখা যায় না।

তার ওপর হিসাবটা করা হয় পাইকারি বাজারের দামকে ধরে। অথচ মানুষ কেনে খুচরো বাজারে যেখানে দাম পাইকারি বাজারের থেকে যথেষ্ট বেশি থাকে। সেটাও হিসাবে আসে না। সংবাদে প্রকাশ, (টাইমস অফ ইণ্ডিয়া ২.৪.০৮) গত দু'বছরে দিল্লিতে পাইকারি বাজারে চালের দাম ৪০ শতাংশ বাড়া সত্ত্বেও সূচকের হিসাব করার সময় তার ২.৪৫ শতাংশকে হিসাবে নেওয়া হয়েছে। এই সব চালাকির হিসাবের যাদুতেই বাজারে সরষের তেলের দাম ৬০ টাকা থেকে ৮০ টাকা হওয়া সত্ত্বেও, অর্থাৎ ৩৩ শতাংশ বাড়া সত্ত্বেও তার ০.৪৯ শতাংশেরও কম হিসাবে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দাম যা-ই বাড়ুক, তার কতটা হিসাবে নেওয়া হবে সেটা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে, বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিকে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ায় মূল্যবৃদ্ধির সরকারি পরিসংখ্যান হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে অথচ কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পবন বনসল সংসদে বলেছেন, আমাদের হিসাবপদ্ধতি বিশ্বের সেরা। ইউ পি এ সরকারের খুঁটি সি পি এমের সদস্যরা তা চুপ করে শুনেছেন। হৈ চৈ করে সংসদ অচল করেননি।

# হাসপাতালে রাধারানি আড়ির সঙ্গে দেখা করলেন এম এস এস নেতৃবৃন্দ

১৮ এপ্রিল নন্দীগ্রামের রাধারানি আড়ি দ্বিতীয় বার সিপিএম-এর দুষ্কৃতীদের দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হয়ে কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর স্বামী প্রতাপ আড়ি ও অপর এক মহিলা নর্মদা শীটও আক্রান্ত হয়ে একই হাসপাতালে ভর্তি হন। খবর পাওয়ার সাথে সাথে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী কমরেড সাধনা চৌধুরীর নেতৃত্বে আটজনের এক প্রতিনিধি দল হাসপাতালে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যান। রাধারানি দেবী সেদিনের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, "১৮ এপ্রিল রাত ১০টা নাগাদ স্বামী, ছেলে, বৌমা সহ রাতের খাবার খাচ্ছিলাম। এমন সময় অতর্কিতে সিপিএম আশ্রিত ১০/১২ জন ক্রিমিনাল, যারা এলাকায় খুন, সন্ত্রাস, আক্রমণ চালাচ্ছে — বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। আমার স্বামী, পুত্ররা বাধা দিলে তাঁদেরও মারধোর করে এবং স্বামীকে পাশের পুকুরে ফেলে দেয়। আমাকে একটু দূরে মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে মুখে মদ ঢেলে দিয়ে ধর্ষণ করে এবং বলে, '১৪ মার্চ তো চিনতে পারিসনি, এবার ভাল করে চিনে নে। এরপর তোর লাশ পড়বে'। পরপর অনেকে অত্যাচার করায় আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। পরে দেখি এলাকার ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নেতারা আমাকে নন্দীগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। সেখান থেকে আমাকে কলকাতার এই হাসপাতালে আনা হয়। আমি চাই, যারা আমার উপর এই অত্যাচার চালিয়েছে, তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দেওয়া হোক।" তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "ওরা ভাবছে এইভাবে বারবার আমার ওপর আক্রমণ করলে আমি আন্দোলন থেকে সরে আসবো, কিন্তু ওদের বলে দেবেন, যতবার ওরা অত্যাচার করবে ততবারই ফিরে গিয়ে আমি আবার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবো।"

নন্দীগ্রাম হাসপাতালে যেভাবে তড়িঘড়ি রাধারানি দেবীর জামাকাপড় জলে ধুয়ে ফেলা হয়েছে, তাতে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হয়েছে বলে প্রতিনিধিরা জানান।

রাধারানি আড়ি, নর্মদা শীট — যাঁরা শত অত্যাচারেও মাথা নত করেননি, তাঁদের সামনে রেখে নন্দীগ্রামের বীরাঙ্গনা মহিলারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

# মহান মে দিবসের আহ্বান

একের পাতার পর

চিন্তাধারাই শ্রমিকশ্রেণীর সামনে রেখেছিলেন সর্বহারার মহান শিক্ষক কার্ল মার্কস। তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তার আধারে মে দিবসের সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর সামনে নতুন তাৎপর্য বহন করে নিয়ে আসে।

পারি কমিউনের ঐতিহাসিক সংগ্রামের পর শ্রমিকশ্রেণীর যে সংগ্রাম চলছিল বিশ্বজুড়ে, সেই পটভূমিতে মার্কস ১৮৭২ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের সদর দপ্তর লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্কে নিয়ে এসেছিলেন। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে আট ঘণ্টা শ্রমদিবসের দাবিতে সংগ্রাম চলছিল দীর্ঘদিন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৮৮৬ সালের ১লা মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের মিশিগান অ্যাভেনিউ ধরে ৮০,০০০ সংগ্রামী শ্রমিক পথে নেমেছিলেন। তাঁদের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত বা আরও দীর্ঘ সময়ের শ্রমদিবসের অবসান ঘটিয়ে ৮ ঘণ্টা শ্রমদিবস চালু করতে হবে। দাবির পিছনে যুক্তি ছিল খুবই পরিষ্কার। ২৪ ঘন্টার দিনটিকে ৮ ঘন্টা করে তিন ভাগ করেছিলেন তাঁরা। এক ভাগ কারখানায় কাজ, পেটের জন্য। এক ভাগ জীবন রক্ষার প্রয়োজনীয় রোজানা কাজ এবং সাংস্কৃতিক জীবনের জন্য, বাকি ৮ ঘন্টা ঘুম ও বিশ্রাম। আট ঘন্টা শ্রমদিবসের দাবি মালিকরা সহজে মেনে নেয়নি, হে মার্কেটের শ্রমিক সভায় পুলিশ দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে তারা শ্রমিকহত্যা করে এবং গ্রেপ্তার করে শ্রমিক নেতা পার্সনস, স্পাইজ, ফিসার ও এঙ্গেলকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কার্ল মার্কস দেখান, শোষণমূলক সমাজে উৎপাদনের চরিত্র সামাজিক অথচ তার মালিকানা হল ব্যক্তিগত। ঐতিহাসিকভাবে উৎপাদন এসেছে সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে অথচ পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য হল মালিকের সর্বোচ্চ মুনাফা — অন্তর্নিহিত এই বিরোধিতার তীব্রতা বাড়তে বাড়তে পুঁজিবাদের কবর রচিত হবে। কিন্তু যেকোনও রকম লড়াই, শ্রমিকদের মুক্তি এনে দেবে না। আপন নিয়মেও পুঁজিবাদ ভেঙে পড়বে না। মার্কস আরও দেখালেন, কেবল বাস্তব প্রয়োজন দেখা দিলেই বিপ্লব ঘটবে না। তিনি দেখান, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের অবসান ঘটবে না, সেজন্য চাই পুঁজিবাদের অবসান ঘটানোর আদর্শে উদ্বুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম। সাংগঠনিক প্রস্তুতির মধ্যেই মিশে আছে আদর্শগত প্রস্তুতি। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর বাঁচার তীব্র সংগ্রাম যে মানবসমাজের আমূল পরিবর্তন এবং ব্যক্তিসম্পত্তি থেকে সমাজমুক্তির সূচনা, সেটা একমাত্র মার্কস-এঙ্গেলসই বুঝেছিলেন। তাই মে দিবসের বাঁচার লড়াই মার্কসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিণত হল শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের প্রস্তুতির কর্মসূচিতে। ১৮৮৯ সালে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মঞ্চ থেকে ১লা মে দিনটিকে 'শ্রমিক সংহতি দিবস' হিসাবে পালনের ডাক দেন। পরবর্তীকালে লেনিন ও স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন সারা দুনিয়া জুড়ে ১লা মে শ্রমিক দিবস পালনের সূচনা ঘটায়।

বর্তমানে বিশ্বপুঁজিবাদ যে তীব্র সংকটে পড়েছে এবং তা থেকে মুনাফার স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য ৮ ঘণ্টার শ্রমদিবস সহ শ্রমিকশ্রেণীর অর্জিত অধিকারগুলি যেভাবে কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছে তারই পটভূমিতে আজ মে দিবসের তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। মালিকশ্রেণীর সঙ্গে আজ যোগ দিয়েছে তথাকথিত মার্কসবাদী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা। ভারত সহ বিশ্বের নানা দেশে শিল্পায়নের নামে তারা এস ই জেড গঠন করছে, যেখানে প্রচলিত শ্রম আইন প্রযোজ্য নয়। অন্যত্রও সর্বপ্রকার শ্রম আইন লঙ্ঘন করার অধিকার মালিকদের দিচ্ছে। মালিকশ্রেণীর পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে দক্ষিণপন্থী দল এবং ক্ষমতাসীন বামপন্থী নামাবলীধারী দল সকলেই একবাক্যে বলছে শ্রমিক আন্দোলন হলে কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, কাজেই দাবিদাওয়া এখন তোলা যাবে না। আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার নামে মালিকরা যা বলবে তা মেনে নিতে হবে। বেতন কাঠামো, চাকরির স্থায়িত্ব, বাঁচার মতো মজুরি, নির্দিষ্ট ঘণ্টার শ্রমদিবস, অবসরকালীন প্রাপ্য — এসব পুরনো দিনের ধারণা। শ্রমিক তার ন্যায্য দাবিসনদ পর্যন্ত পেশ করবে মালিকের সম্মতির ভিত্তিতে। আর মালিকরা নিত্য নতুন দাবি সনদ পেশ করবে সরকারের কাছে — বিনা পয়সায় বা স্বল্প মূল্যে জমি, জল, বিদ্যুৎ দিতে হবে, ট্যাক্স মকুব বা দীর্ঘদিনের জন্য করছাড় দিতে হবে, ইত্যাদি। শিল্পায়নের ধোঁকায় জনগণকে বিভ্রান্ত করে মালিকদের সকল দাবি মেটানোই এখন মালিকশ্রেণীর সরকারগুলির কাজ। সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক বেসরকারীকরণ হচ্ছে শুধু নয়, বাস্তবে সরকারি শ্রমদপ্তরগুলি এখন জনগণের টাকায় পোষা মালিকদের স্বার্থরক্ষাকারী সংস্থায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বায়নের নীতি অনুযায়ী কংগ্রেস বা বিজেপি শুধু নয় রাজ্যের সি পি এম সরকারও শ্রমিককে মালিকস্বার্থের কাছে বলি দিচ্ছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের ঘটনায় সি পি এম দল ও সরকারের ভূমিকা নিঃসন্দেহে তাদের শ্রমিকবিরোধী চরিত্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু মালিকশ্রেণীর আক্রমণের পাশাপাশি গড়ে উঠছে প্রতিরোধ আন্দোলন। বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমিকরা পথে নামছে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বত্র মানুষ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে। আমেরিকার বুকে কালো মানুষরা, লাতিনোরা, অভিবাসী ভারতীয় শ্রমিকরা আন্দোলনে নামছে। পুঁজিবাদী চীনেও মেহনতি মানুষ এস ই জেড-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সোচ্চার হচ্ছে। এরাজ্যে নন্দীগ্রাম দেখিয়ে দিয়েছে সংগঠিত জনশক্তির সামনে শাসকদের পিছু হঠতে হয়। একদিন মে দিবস শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল, আজকের মে দিবস ডাক দিচ্ছে সেই সংগঠিত সংগ্রামকে মার্কসবাদী বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত করে, সকল প্রকার সংশোধনবাদ সংস্কারবাদের হাত থেকে মুক্ত করে, অপরাজেয় শক্তির আধার হিসাবে গড়ে তোলার। শ্রমিক বিপ্লবের বাস্তব জমি আজ তৈরি, দরকার তার আদর্শের আলোকবর্তিকা। সেই আদর্শকে আত্মস্থ করার আহ্বান নিয়ে এসেছে এবারের মে দিবস।

# নির্বাচনের পর ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের প্রস্তুতি নিন

একের পাতার পর

নিয়েছি এই আশা নিয়ে যে, আগামী দিনে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর সিপিএম বিরোধী আন্দোলনে আমাদের দুই দলের ঐক্য শক্তিশালী হবে। আমরা জনগণকে সিপিএমের বিরুদ্ধে ভোট দিতে বলব, অন্যদিকে কংগ্রেস বিজেপিকে পরাস্ত করার আহ্বান জানাব। সর্বত্রই এস ইউ সি আই এবং তৃণমূলের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করতে বলব। যেখানে তৃণমূল প্রার্থীও নেই, কংগ্রেস বিজেপিকে বাদ দিয়ে অন্য প্রার্থী আছেন বা নির্দল সৎ প্রার্থী থাকেন এবং তাঁরা যদি গণআন্দোলনে যুক্ত হতে চান, তাঁদেরকেও সমর্থন করার কথা আমরা বলব। আমরা গ্রামের জনগণের কাছে আবেদন করব, ভোট দেওয়ার আগে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে সিপিএমের নিষ্ঠুর আক্রমণের বলি শহীদদের এবং নির্যাতিতা, ধর্ষিতা মা-বোনেদের মুখগুলি একবার স্মরণ করবেন। টাকার জোরে, দাপটে ওরা আপনার ভোট লুঠ করে নিতে পারলে মনে করবে ক্ষমতার জোরে যা ইচ্ছা তাই করা যায়। ওদের ডোন্ট কেয়ারভাব আরও বাড়বে। আর বুক ঠুকে প্রচার করবে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে সিপিএম ঠিক কাজ করেছে, জনগণের রায় তাই বলছে। এই সর্বনাশ আর হতে দেবেন না।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, পার্লামেন্ট হোক, বিধানসভা হোক, পৌরসভা হোক আর পঞ্চায়েত হোক, আমরা মনে করি, কোনও ইলেকশনই এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হচ্ছে না, হতে পারে না। আমাদের দেশ শ্রেণীবিভক্ত এবং জনসাধারণ এখানে মজুরি-দাস। সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত হচ্ছে ওয়েজ-স্লেভ। অর্থনৈতিকভাবে শোষিত এবং রাজনৈতিকভাবেও তারা অত্যাচারিত, শৃঙ্খলিত। এ রকম একটা দেশে, বিশেষ করে যেখানে অধিকাংশ জনগণ শিক্ষাবঞ্চিত, রাজনৈতিকভাবে অসচেতন এবং অসংগঠিত সেখানে নির্বাচনের নামে প্রহসন হচ্ছে। বাস্তবে মানি পাওয়ার, মাসল পাওয়ার এবং শাসকশ্রেণী ও শাসক দলের নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যম, আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক শক্তি — এই হচ্ছে নির্বাচন ও তার ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রথম ও শেষ কথা। কোনও নির্বাচনকেই এই ব্যবস্থায় প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক নির্বাচন বা ফলাফলকে জনগণের রায় বলা চলে না; যাকে verdict of the people বলা হয়, বাস্তবে তা হচ্ছে verdict of the money power। এই অবস্থায় democratic election বলা মানে hypocricy without limitation, simple deception । সকল পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশেই পচাগলা বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির আজ এই একই দশা। এ সত্ত্বেও আমরা অংশগ্রহণ করছি এই জন্য যে, ইলেকশনের বিকল্প আমরা এখনও সৃষ্টি করতে পারিনি, ইলেকশন বয়কট করে জনগণকে পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবের রাস্তায় এখনও আমরা আনতে পারিনি। যতদিন এ অবস্থা থাকবে, ততদিন পর্যন্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার শিক্ষা অনুযায়ী আমরা নির্বাচনে অংশ নেব।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রামের জনগণের হাতে গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণ, এসব বুলিও ভণ্ডামি। কারণ, এদেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীভূত এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের যা ছিঁটেফোঁটাও ছিল তাও পদদলিত। গ্রামের দারিদ্র দূরীকরণ, সমস্ত দিক থেকে গ্রামের ব্যাপক উন্নতি ঘটানো ইত্যাদি বহুঘোষিত যেসব স্কিম প্রচার করা হয়, সেগুলোও বাস্তবে প্রতারণাই। নানা স্কিমে যা কিছু টাকা আসছে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের নামে, যা আসলে জনগণেরই টাকা, তার বিরাট অংশ স্তরে স্তরে আত্মসাৎ হয়ে যাচ্ছে। নানা স্কিমে শত শত কোটি টাকা ওরা লোপাট করে দিচ্ছে। পঞ্চায়েত চূড়ান্ত দুর্নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এ জিনিস ভারতবর্ষের সর্বত্রই হচ্ছে, এ রাজ্যে আরও সংগঠিত আকারে হচ্ছে। অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে কংগ্রেস-বিজেপি ঢিলেঢালা পার্টি হিসাবে যা করে, সিপিএম অনেক সংগঠিত পার্টি হিসাবে তার থেকে অনেক বেশি এরাজ্যে করছে। এটা সকলেই জানেন। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জনগণের একটা অংশকেও দুর্নীতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। পঞ্চায়েত হচ্ছে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি ও সরকারি প্রশাসনের

২৮ এপ্রিল 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে কমরেড প্রভাস ঘোষ। তাঁর বাঁ দিকে প্রেস ক্লাবের সভাপতি শ্রী কমল ভট্টাচার্য ও ডানদিকে সম্পাদক শ্রী কুশল দাশগুপ্ত

সম্প্রসারিত অংশ। পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করা হয়েছে। ফলে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারি নীতিগুলিই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত হতে পারে, তার বেশি কিছু নয়। পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আইন ও নির্দেশের গণ্ডির মধ্যেই কাজ করতে হচ্ছে, এর বাইরে তার যাওয়ার উপায়ও নেই। দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামীণ জনগণের উপর আর এক আঘাত হিসাবে সরকার প্রচুর পঞ্চায়েতি ট্যাক্স চালু করেছে, যা আপনারা আমার থেকে ভাল জানেন। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে খাজনাও ব্যাপক বাড়িয়েছে।

পঞ্চায়েতকে ভিত্তি করে গ্রামাঞ্চলে শাসক দল, জোতদার, ব্যবসাদার, কন্ট্রাকটর, স্মাগলার, সমাজবিরোধী ও পুলিশের একটা দুষ্টচক্র চলছে। গ্রামাঞ্চলে এটা একটা ভয়ঙ্কর বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে। নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও পঞ্চায়েত যতটুকু কল্যাণমূলক কাজ করতে পারত, এই দুষ্টচক্রের জন্য সেটাও সম্ভব হচ্ছে না। পঞ্চায়েতকে ব্যবহার করা হচ্ছে ভোটব্যাংক রাজনীতির যন্ত্র হিসাবে। এ রকম একটা অবস্থায় আমরা মনে করি, পঞ্চায়েতকে সামান্য অর্থেও জনমুখী করার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হলেও যেটা অত্যন্ত প্রয়োজন, তা হল, গ্রামাঞ্চলে জনগণকে সংগঠিত করা, সংগ্রামী রাজনৈতিক চেতনা দেওয়া, গণকমিটি গঠন এবং উন্নত নৈতিক বলে লাগাতার আন্দোলনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা। এর মধ্য দিয়ে এই দুষ্টচক্র ও সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে যতটুকু সম্ভব দুর্নীতিকে দূর করার চেষ্টা, অন্তত নিয়ন্ত্রণ করা, তার ভিত্তিতে কিছু কল্যাণমূলক কাজ করা। এ না হলে পঞ্চায়েতের দ্বারা জনগণের ক্ষতিই করা হচ্ছে, এ কথা আমি বলতে পারি।

আমাদের পার্টি পঞ্চায়েতে প্রার্থী দেওয়ার ক্ষেত্রে কে কোথায় জিতবে এটা বিচার করে না, জাত-পাত-ধর্ম এসব দেখে না, আমরা সব সময় গুরুত্ব দিই সার্বিকভাবে রাজনৈতিক চেতনা, সংস্কৃতিগত মান কার কেমন এবং জনগণের প্রতি দরদ ও দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে কারা কাজ করবে, তার ওপর। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমরা মনে করি, আমাদের দলেরও যেকোনও কর্মী নির্বাচিত হলে এই ব্যবস্থায় দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। এর বিরুদ্ধেও গ্যারান্টি হচ্ছে গণআন্দোলন এবং দলের স্থানীয় নেতৃত্বের সজাগ প্রহরা। আর আমরা দাবি করেছি, জনগণকে 'রাইট টু রিকল'-এর অধিকার দিতে হবে। অর্থাৎ ভোটের পর নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি জনস্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, তবে পাঁচ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা না করে যেকোনও সময় জনগণের যেন তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার থাকে। এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দাবির ভিত্তিতেই আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়ছি।

এ রাজ্যে সরকার সমানে প্রচার করছে গ্রামের কী বিরাট উন্নয়ন হয়েছে! কিন্তু গ্রামাঞ্চলের বাস্তব চিত্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এ রাজ্যে ক্রমাগত খেতমজুর বেড়েই চলেছে। '৭৭ সালে রাজ্যে খেতমজুরের সংখ্যা ছিল ৩২ লক্ষ ৭০ হাজার। সেটা বাড়তে বাড়তে ২০০১ সালে দাঁড়িয়েছে ৭৩ লক্ষ ৫১ হাজার। ধরে নেওয়া যায় বর্তমানে প্রায় এক কোটির কাছাকাছি খেতমজুর হয়েছে। এটা কি উন্নয়নের চিত্র ? অনাহারে-অর্ধাহারে থাকা পরিবার, ভারতের মধ্যে এ রাজ্যে সবচেয়ে বেশি। যেখানে জাতীয় গড় ১.৯ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে সেটা ৯ শতাংশ। এ রাজ্যে বিপিএল লিস্টের ৮০ শতাংশ মানুষ আর্থিক কারণে বরাদ্দ রেশনই সবটুকু তুলতে পারেন না। গ্রাম থেকে লক্ষ লক্ষ লোক যেমন শহরে আসছে, তেমনই অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। কোনও কর্মসংস্থান নেই। যদিও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের অনেক স্কিম ঘোষণা করা হয়। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে এ রাজ্যে গড়ে একবার মাত্র ১৪ দিন, পরের বার ১১ দিন কাজ দেওয়া হয়েছে। বাকি টাকা ফেরৎ চলে গেছে। এর মধ্যেও কাজ না করিয়ে কাজ করানো হয়েছে দেখিয়ে সিপিএম নেতারা টাকা আত্মসাৎ করেছে। রাজ্যের আর একটা তথাকথিত অগ্রগতির চিত্র হচ্ছে — ভারতবর্ষের মধ্যে এ রাজ্যে দৈনিক মজুরি সবচেয়ে কম, মাত্র ৭০ টাকা। কৃষিতে বিদ্যুতের দাম সবচেয়ে বেশি, ইউনিট প্রতি সাড়ে তিন টাকা। তামিলনাড়ু এবং পাঞ্জাব চার একর পর্যন্ত বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দিচ্ছে। অন্যান্য জায়গায় কোথাও ৫০ পয়সা, কোথাও আর একটু বেশি। মহারাষ্ট্র ১.৬৫টাকা করে নেয়, কিন্তু এ রাজ্যে সাড়ে তিন টাকা করে নিচ্ছে। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে জাতীয় গড় যেখানে ৭০%, এরাজ্যে সেখানে মাত্র ৩০%। নারীপাচারে এ রাজ্য প্রথম। ধর্ষণ ও বধূহত্যাতেও এ রাজ্য রেকর্ড করেছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক হল, এ রাজ্য থেকে ৮-৯ বছরের মেয়েরাও দেহ ব্যবসায় যেতে বাধ্য হচ্ছে। ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকায় বাবা-মা মেয়েকে বিক্রি করে দিচ্ছে। শহরে-গঞ্জে-স্টেশনে অন্ধকার নামলেই শত শত গ্রামের গরিব বৌ-মেয়েরা দেহ বিক্রির জন্য দাঁড়ায়, ঘরে অভুক্ত সন্তান, অসুস্থ কর্মহীন স্বামী, অক্ষম বাবা-মা, ভাইবোন। কতজন সন্তানসহ আত্মহত্যা করছে এক মুঠো খাদ্য জোগাড় করতে না পেরে। এর থেকে মর্মান্তিক চিত্র আর কি হতে পারে! এর নাম কি উন্নয়ন! বুনিয়াদি শিক্ষায় ৩৫টি রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মধ্য এ রাজ্য ৩২তম স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। '০৫-'০৬ সালে দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল ছুটের সংখ্যা হচ্ছে ৮০.২৪ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুল চালু হয়ে গেছে। শহরে তো হয়েছেই। শিক্ষায় ডোনেশন, সেল্ফ ফিনান্সিং চালু হয়েছে। এইভাবে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ হচ্ছে। যার ফলে শিক্ষা ক্রমাগত গরিব-মধ্যবিত্তদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে ১০ হাজারের উপর স্বাস্থ্যকেন্দ্র সরকার ধীরে ধীরে তুলে দিচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্কের টাকা নিয়ে কিছু বিল্ডিং করেছে এবং তার শর্ত মেনে চার্জ বসাচ্ছে, ফলে চিকিৎসার সুযোগও গরিব মানুষের নাগালের বাইরে যাচ্ছে। আন্ত্রিক, ম্যালেরিয়া, চিকনগুনিয়া, ডেঙ্গু, টিবি, নানা অজানা জ্বর প্রভৃতি গোটা গ্রামাঞ্চলে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। কোনও ওষুধ নেই। গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে সাপে কামড়ের ওষুধ, কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ পাওয়া যায় না। বেড কমানো হচ্ছে, রোগীর ওষুধ, স্যালাইন কিনে দিতে হয়, খাবার দিতে হয়, অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া দিতে হয়। শহরের মতো গ্রামেও প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপের নামে হাসপাতালগুলিতেও বেসরকারি সংস্থাকে ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। অধিকাংশ গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা হয় নি। ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীর কথা অনুযায়ী রাজ্যে চার লক্ষ একর কৃষিজমি অকৃষি কাজে চলে গেছে। এগুলি গেছে নগরায়ণে অর্থাৎ উপনগরীতে, রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা বা বাড়ি তৈরি করে বিক্রির ব্যবসায়, টাটা-জিন্দাল-আম্বানি-সালেমদের ব্যবসায়। কৃষিকে বন্যা ও খরার আক্রমণ থেকে বাঁচানোর সরকারি উদ্যোগ নেই। অধিকাংশ গরিব কৃষক ও খেতমজুর সুদখোর-মহাজনদের ঋণের ফাঁসে বাঁধা। রাজ্যে প্রফুল্ল সেন সরকারের সময়ে কৃষকদের থেকে লেভি আদায় করা হত, এখন মিল মালিকদের উপর সবটাই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সরকার প্রতি বছর সংগ্রহের ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার সামান্যই সংগ্রহ করে। বিপিএল তালিকা থেকে অধিকাংশ গরিবকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার রেশনে যে সামান্য চাল-গম সাপ্লাই করে, রাজ্য তাও তুলছে না, এই অজুহাতে কেন্দ্র সাপ্লাই কমাচ্ছে, আবার ডিলার-

আটের পাতায় দেখুন

## নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গে সোনিয়া গান্ধীর কুম্ভীরাশ্রু

২৮ এপ্রিল মালদায় কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গে বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৯ এপ্রিল এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন —

"কংগ্রেস সভানেত্রীর মন্তব্য শুনে মনে হয় তিনি যেন গত বছরের জানুয়ারি মাস থেকে এ বছরের ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন; নন্দীগ্রামে এত খুন, নারীধর্ষণ ও রক্তপাত হলো, তিনি যেন কিছুই টের পাননি এবং এখন পঞ্চায়েত ভোটের মুখে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পা দিয়ে নন্দীগ্রামের ঘটনা জানতে পেরে সান্ত্বনার বাণী শোনাচ্ছেন। বাস্তবে নন্দীগ্রামে যখন নৃশংস অত্যাচারের তাণ্ডব চলেছে তখন কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকার আগাগোড়া সি পি এম ও রাজ্য সরকারকে মদত দিয়েছে, তাদের সাথে দহরম মহরম চালিয়ে গেছে, একবারও অন্তত মৌখিক প্রতিবাদও করেনি।

কংগ্রেস নেত্রীর জানা উচিত, এরকম কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে, ভণ্ডামি করে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে ঠকানো যায় না।"

# সিপিএমের 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' জেতার নেপথ্য কাহিনী

**সংবাদপত্রের পাতা থেকে**

**ভয় দেখিয়ে কেশপুর, গড়বেতা, আরামবাগের বহু আসন বিনা লড়াইয়ে জিতে নিল সিপিএম**

(বর্তমান, ১৭-৪-০৮)

কোথাও ভয় দেখিয়ে, কোথাও বিরোধী প্রার্থীদের মেরে এবারও কেশপুর, গড়বেতা, আরামবাগ, গোঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রাম থেকে জেলা পরিষদ পর্যন্ত পঞ্চায়েতের বহু আসন সিপিএম বিনা ভোটেই জিতে নিল।

মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে গড়বেতা ১ নম্বর ব্লকটি পুরোপুরি বিরোধীশূন্য হয়ে গেল। গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৪টি, পঞ্চায়েত সমিতির ৩০টি এবং জেলা পরিষদের দু'টি আসনই সিপিএম বিনা ভোটে জিতেছে। মন্ত্রীর কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত গড়বেতা ৩ নম্বর ব্লকে দু'টি জেলা পরিষদের আসনে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারেনি। লাগোয়া কেশপুর বিধানসভা কেন্দ্রেও ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সবক'টি আসনেই সিপিএম জয়ী। এছাড়া গড়বেতা ২ নম্বর ব্লক, চন্দ্রকোণা, শালবনি, পিংলাসহ পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে সিপিএম বিনা ভোটে জিতে নিয়েছে অনেক আসন।

আরামবাগ মহকুমায় খানাকুলে জেলা পরিষদের একটি আসন এদিনই বিনা ভোটে জিতে নিয়েছে সিপিএম। এই আসনে তৃণমূল প্রার্থী বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে, সিপিএম ক্যাডাররা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাঁকে ভাগিয়ে দেয়। আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া ছাড়া কোথাও তৃণমূল এবং কংগ্রেস মিলিতভাবে ২০ শতাংশ আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি। গোঘাট ব্লকে আরও কম আসনে লড়াই হবে। হুগলি জেলায় মোট ৭০০ আসন সিপিএম, ফরওয়ার্ড ব্লক সহ বামফ্রন্টের শরিকরা বিনা লড়াইতে জিতে নিল।

**মনোনয়নপত্র জমা দিলেই খুনের হুমকি**

(দৈনিক স্টেটসম্যান, ২০-৪-০৮)

সিপিএমের হুমকি ও সন্ত্রাসে বীরভূমের বেশ কয়েকটি ব্লকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারছে না তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা। মনোনয়নপত্র জমা দিলে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বেশ কিছু পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা স্থির হতেই রাতের অন্ধকারে প্রার্থীর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি আসছে বলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। নানুর এলাকার সুচপুর, বাইতাড়া, সাকোড্ডা, সোহালা অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রার্থী দিতে দিচ্ছে না সিপিএম। চলছে ব্যাপক আক্রমণ। প্রার্থীদের হুমকি দিয়ে সিপিএম বাড়ি ঘিরে রেখেছে, যাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে। পাপুড়ি গ্রামে চলছে ব্যাপক বোমাবাজি। বাইরে থেকে নমিনেশন ফাইল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ, গ্রামে ঢুকতে দিচ্ছে না সিপিএম। এই সমস্ত এলাকায় পুলিশের কোনও সাহায্য পাওয়া যায়নি। পুলিশ শাসকদলের নির্দেশে কাজ করছে।

**মনোনয়নপত্র ঃ তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের ঘরে আগুন আমতায়**

(বর্তমান, ১৭-৪-০৮)

হাওড়া জেলার আমতার চন্দ্রপুরে গ্রাম পঞ্চায়েতের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল প্রার্থীদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল সিপিএমের বিরুদ্ধে। এছাড়া তৃণমূলের ১১ জন প্রার্থীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

**আরামবাগে আরএসপি প্রার্থীদের পেটাল সিপিএম-সহ তিন শরিক**

(বর্তমান, ১৬-৪-০৮)

মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র দাখিল করতে গিয়ে আরামবাগে আরএসপি'র প্রার্থীরা সিপিএম, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং সিপিআই কর্মীদের হাতে মার খেলেন। তার ফলে এদিন আরএসপি মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেনি। এই ব্যাপারে বামফ্রন্টের অন্য শরিক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে আরএসপি নেতৃত্ব থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।

আরএসপি'র চার প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করতে গেলে ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিআই এবং সিপিএমের কর্মীরা তাঁদের উপর হামলা করে। মনোনয়নপত্র এবং ডি সি আর-এর কপি ছিঁড়ে দেয়।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে গোলমাল চললেও পুলিশ ধারেকাছে থাকা সত্ত্বেও এগিয়ে আসেনি।

**পর্যবেক্ষকের সামনেই সিপিএমের মার**

(বর্তমান, ১৭-৪-০৮)

খোদ পর্যবেক্ষকের সামনেই পুলিশকে দাঁড় করিয়ে রেখে সিপিএম সমর্থকরা তৃণমূল সমর্থকদের তাড়া করল, ঘেরাও করে রাখল। বুধবার বর্ধমানের রায়নার শ্যামসুন্দরের বিডিও অফিসে তৃণমূল সমর্থকরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে শুরু হয় উত্তেজনা।

বুধবার রায়না গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থীপদে মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসেন তৃণমূলের কৃষ্ণা মাঝি। বিডিওর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাঁর পথ আটকায় সিপিএম সমর্থকেরা। মারধর করা হয় কৃষ্ণা মাঝিকেও। খবর পেয়ে রায়নার জন্য নির্দিষ্ট অবজারভারদের উপস্থিতিতে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছলেও কার্যত তাদের সামনেই সিপিএম সমর্থকরা তাণ্ডব চালায়।

**বীরভূম, জলপাইগুড়ি, দুই দিনাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় হুমকি সিপিএমের বহু জেলায় প্রার্থী দিতে পারল না আরএসপি**

( দৈনিক স্টেটসম্যান ১৭-৪-০৮)

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সিপিএমের সঙ্গে শরিকি বিবাদ ক্রমশ বাড়ছে। নির্বাচনে লড়াই করলে 'দেখে নেব' হুমকি দিচ্ছে সিপিএম। সিপিএমের হুমকিতে বেশ কিছু জেলাতে প্রাণভয়ে বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি আরএসপির বহু প্রার্থী। বীরভূম, জলপাইগুড়ি, দুই দিনাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণাতে প্রাণভয়ে আরএসপির প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে না পারায় রাজ্য নেতৃত্ব রীতিমতো ক্ষুব্ধ। মনোনয়নপত্র জমা দিতে না পারার জন্য সিপিএমকেই প্রকাশ্যে দায়ী করেছে আরএসপি। ...

অন্যদিকে জলপাইগুড়িতে গোলমাল অব্যাহত রয়েছে। মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার সময় সিপিএমের হাতে বেদম মার খেয়েছেন আরএসপি-র প্রার্থীরা। ... আরএসপি-র পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক অমৃত মাইতি জানিয়েছেন, ওই জেলাতেও বিভিন্ন এলাকায় সিপিএম কর্মীরা তাঁদের প্রার্থীদের হুমকি দিচ্ছে। দেওয়াল লিখন মুছে দিচ্ছে।

**রায়না বিডিও অফিসে পুলিশের সামনেই বিরোধীদের মার**

(বর্তমান, ১৭-৪-০৮)

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতার জন্য সিপিএম কোথাও হুমকি দিয়ে গৃহবন্দি করে রেখে, কোথাও

# একমাত্র জনগণের সংগঠিত আন্দোলনই সন্ত্রাস রুখতে পারে

২০০৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম ও শরিকরা মিলে প্রায় ৬৫০০ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিল। এবার নির্বাচনের আগেই সিপিএম ২৩৬২টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৪৪৩টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৮টি জেলা পরিষদ সহ মোট ২৮১৩টিআসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে।

সিপিএম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সবচেয়ে বেশি আসন দখল করেছে হুগলি জেলায়। এই জেলায় ৭৫২টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে তারা এভাবে জিতেছে। এছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ৭৩০, বর্ধমানে ৪৭৪, বাঁকুড়ায় ১৭১, উত্তর ২৪ পরগণায় ১৮০টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে তারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছে।

বিভিন্ন সংবাদপত্র এ বিষয়ে যে চিত্র তুলে ধরেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, মূলত সিপিএমের সন্ত্রাসের জন্যই বহু বিরোধী সমর্থক নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন নি বা চাননি।

এই সন্ত্রাসের মধ্যেও যাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, দেখা যাচ্ছে তাঁদের একটা বিরাট অংশ শেষ মুহূর্তে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন। ২৩ এপ্রিল 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের সচিব এস এন রায়চৌধুরী বলেছেন, ব্যাপক হারে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের ঘটনা ঘটেছে হুগলির আরামবাগ মহকুমায়। সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৯৬টি আসনের মধ্যে ১৫১টি আসনেই বিরোধীদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহৃত হয়েছে। এই তথ্য কি প্রমাণ করে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারেনি? নাকি প্রমাণ করে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিলেন রাতারাতি তাদের অনিচ্ছুক হওয়ার পেছনে অন্য কোনও রহস্য আছে?

ঐ জেলার গোঘাট-১ ব্লকে ৯৭টি আসনের মধ্যে ৬০টিতে প্রার্থীপদ প্রত্যাহৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ৬২ শতাংশ আসনে প্রার্থী প্রত্যাহৃত হয়েছে। গোঘাট ২নং ব্লকে ১১০টি আসনের মধ্যে ১০২টিতে প্রার্থীপদ প্রত্যাহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এই ব্লকে প্রায় ৯৩ শতাংশ আসনে প্রার্থীপদ প্রত্যাহৃত হয়েছে। এই যে পাইকারি হারে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের ঘটনা রাতারাতি ঘটল — এ কি স্বাভাবিক? পঞ্চায়েতে প্রার্থী হওয়ার জন্য যখন কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, দল প্রার্থী না করলে বহু মানুষ এমনকী নির্দল হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়, তখন বিরোধীদের ক্ষেত্রে পাইকারি হারে প্রত্যাহারের ঘটনা কোনমতেই স্বাভাবিক বলা চলে না।

প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের ঘটনাগুলি থেকে জানা যাচ্ছে, সিপিএম সন্ত্রাস কায়েম করতে এবার ক্রিমিনাল বাহিনী নিয়োগ করেছিল। এই ভাড়াটে ক্রিমিনাল বাহিনীকে যে এলাকায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সেই এলাকায় পাইকারি হারে সন্ত্রাস কায়েম করে বিরোধীদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহারে তারা বাধ্য করেছে। এই সন্ত্রাসের কিছু খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

গত ৩০ বছর ধরে সিপিএম প্রচার করে যাচ্ছে যে, তাদের শাসনে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিতই শুধু নয়, ভারতের সকল রাজ্যের মধ্যে তা আদর্শস্বরূপ। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে সময় মতো নির্বাচন হওয়াকেই দেখায়। কিন্তু কীভাবে সেই নির্বাচন হয়, তা নিয়ে তারা নীরব থাকে। গণতন্ত্রে নির্বাচন মানেই যেকোনও দল বা ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে, স্বাধীনভাবে নিজেদের সমর্থনে প্রচার করতে পারবে এবং ভোটাররাও তাদের পছন্দমত প্রার্থীদের অবাধে ভোট দিতে পারবে। যে নির্বাচনে সন্ত্রাস কায়েম করে বিরোধীদের প্রার্থী হতে বাধা দেওয়া হয়, প্রার্থী হলে প্রত্যাহারে বাধ্য করা হয়, এলাকায় এলাকায় প্রচারের কাজে হামলা চালানো হয়, দরিদ্র অভাবগ্রস্ত মানুষের ভোট টাকা দিয়ে কেনা হয়, নির্বাচনের দিন বিরোধী পোলিং এজেন্টদের মেরে বুথ ছাড়া করা হয়, অবাধে ছাপ্পা মারা হয় — তাকে কি সুষ্ঠু নির্বাচন বলা যায়? অথচ সেটাই 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের' নির্বাচন কমিশনের চোখের সামনে বছরের পর বছর হয়ে চলেছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পুলিশ-প্রশাসনকে পাশে নিয়ে সিপিএমের চরম সন্ত্রাসই ওই পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে তাদের 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' জয়ের মূল কারণ। এই 'জয়ে' যে শাসকদল আনন্দোৎসব করে, তাদের জেনে রাখা উচিত, এ সন্ত্রাস একদিন ব্যুমেরাং হয়ে আসে।

সিপিএম শাসনে অতিষ্ঠ গণতন্ত্রপ্রিয় সমস্ত মানুষেরই প্রশ্ন, এই সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করা যাবে কী উপায়ে? আমরা মনে করি, সংগঠিত জাগ্রত জনশক্তির সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া সিপিএমের মতো একটি সংগঠিত সন্ত্রাসী শক্তিকে প্রতিরোধ করা যাবে না। আমরা নির্বাচনের আগেই এলাকায় এলাকায় নন্দীগ্রাম মডেলে গণকমিটি গঠন করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার ও সেই প্রক্রিয়ায় আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার যে প্রস্তাব তৃণমূল কংগ্রেসকে দিয়েছিলাম, তা যদি করা যেত, তবে এই সন্ত্রাসকেও প্রতিরোধ করা সম্ভব হত।

---

বিডিও অফিসের গেট আটকে রেখে মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসা বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের পেটাল। তবে সব চেয়ে বেশি সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে জেলা পরিষদের সভাধিপতি উদয় সরকারের কেন্দ্র রায়না-১ ব্লক অফিসে। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে ক্যাডাররা পুলিশের সামনেই তাঁদের পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়। হেনস্থার হাত থেকে বাদ যাননি মহিলারাও।...

বিরোধীরা যাতে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য ভিতরে যেতে না পারে তার জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল কিছু জঙ্গি ক্যাডারকে। তাদের নজর এড়িয়ে এদিন বিরোধী দলের যাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ক্যাডাররা তাঁদের বিডিও অফিস থেকে বের হওয়ার পথে আটকায়। পুলিশের সামনেই তাঁদের মারধর করে বলে, নাম প্রত্যাহার না করলে আরও পেটাই হবে।

অরুণ গুহকে মনোনয়নপত্র তুলে নিতে বাধ্য করেছে। এছাড়া পার্থ বসু এবং শুভেন্দু দলুই মনোনয়ন জমা দিতে গেলে তাঁদের বেধড়ক পিটিয়েছে। এছাড়া কেতুগ্রাম-১ ব্লকে কান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঁচজন কংগ্রেস প্রার্থীকে সিপিএম দিনভর ঘেরাও করে রাখায় তাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি।

**পাণ্ডবেশ্বরে বিরোধীদের মনোনয়ন বাতিল না করায় বিডিও-কে ঘেরাও করল সিপিএম**

(বর্তমান, ১৯-৪-০৮)

সিপিএমের দাবি মতো বিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাতিল না করায় ক্যাডারবাহিনী বিডিওকে দুপুর তিনটে থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখে। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক মহকুমা শাসককে জানানোর পর পার্টির উর্ধ্বতন নেতৃত্বের নির্দেশে সিপিএমের কর্মীরা ঘেরাও তুলে নেয়।

বিডিও সিদ্দিক আলম শেখ বলেন,

ছয়ের পাতায় দেখুন

### ইরাক থেকে ফিরে এসে এক মার্কিন মেরিন বললেন

# আমাদের খুন করারই ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে

আমার বয়স ৩২ বছর এবং আমি একজন মনোবিকারগ্রস্ত খুনি। আমি একটাই কাজ পারি — আমেরিকার যুবকদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করতে ও খুন করতে। আমার কাছে সেনাবাহিনীর বাইরের লোকেরা হচ্ছে ঘৃণ্য জনগণ, যারা মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ, দুর্বল। এরা আমার বিচারে নিছক ভেড়ার দল। আমি হচ্ছি ভেড়া শিকারি কুকুর। আমি একজন শিকারজীবী। মার্কিন সেনাবাহিনীতে অন্যরা আমাকে 'হাঙর জিমি' বলে ডাকত।

এই হচ্ছে তিন বছর আগে লেখা জিমির বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি অংশ। সাংবাদিক নাতাহা সওলনিয়েরের সহায়তায় লেখা বইটির নাম "কাউবয়েজ অফ হেল।" ২০০৭ সালে কারাকাস বই মেলায় প্রথম বইটি প্রকাশিত হয়। ২০০৩ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে আগ্রাসনে প্রথম যে মার্কিন মেরিন সেনা (যুদ্ধজাহাজে যে সেনা থাকে, তাকে 'মেরিন' বলা হয়) ইরাকে ঢুকেছিল, জিমি ছিলেন তাদের একজন। নিজের ১২ বছরের নির্দয় সেনাজীবনের কাহিনী এবং কীভাবে ও কেন ইরাক যুদ্ধ তাঁকে বদলে দিল, সেকথা সকলকে জানাতে তিনি এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একই কাহিনী বারবার বলতেও তাঁর আপত্তি নেই। নিজের লেখায় তিনি জানিয়েছেন, ইরাকের বুকে নির্মম হত্যাকাণ্ড তার একার কাজ নয়, অন্যান্য মার্কিন মেরিন ও সেনারাও একই কাজ করেছে ও করে যাচ্ছে। চার বছর হল জিমি সেনাবাহিনী ছেড়েছেন, কিন্তু আজও তাঁকে সেই জীবন দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে।

**প্রশ্ন ঃ** মার্কিন মেরিনদের মধ্যেই আপনি জীবনে সবচেয়ে বাজে লোকেদের সংস্পর্শে এসেছেন — একথা বলেছেন কেন?

**উত্তর ঃ** মেরিনদের ব্যবহার করার দু'টিমাত্র উপায় আমেরিকার আছে — কোনও মানবিক সহায়তামূলক কাজের জন্য কোথাও পাঠানো, অথবা খুনি হিসাবে ব্যবহার করা। আমি ১২ বছর ধরে মেরিন ছিলাম, একবারের জন্যও আমি কোনও মানবিক মিশন-এ যাইনি।

**প্রশ্ন ঃ** ইরাকে যাওয়ার আগে আপনার কাজ ছিল মার্কিন মেরিন বাহিনীর জন্য যুবকদের 'রিক্রুট' করা। আমেরিকার একজন রিক্রুটিং অফিসারের বর্ণনা দিতে পারেন?

**উত্তর ঃ** রিক্রুটিং অফিসার প্রথমত একজন মিথ্যাবাদী। সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে মার্কিন যুবকদের বাধ্য করেছে বুশ সরকার। এজন্য প্রশাসন মূলত যেটা করে থাকে, আমিও যেটা করেছি, তা হল আর্থিক সুযোগ-সুবিধার জালে তাদের ধরে ফেলা। আমি চাকরির তিন বছরে ৭৪ জন যুবককে রিক্রুট করেছিলাম। তাদের কেউ কখনও আমায় বলেনি যে, দেশকে রক্ষা করার জন্য অথবা কোনরকম দেশপ্রেমের টানে তারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চায়। তারা শুধুমাত্র অর্থ রোজগার করতে চেয়েছে, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে পারে, অথবা নিজের পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যবীমা করাতে পারে। আমি তাদের প্রথমেই বলতাম সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তারা আমাদের স্বদেশভূমির সেবা করবে ! ধনীর ঘরের কোনও ছেলেকে আমি কখনও রিক্রুট করিনি। রিক্রুটিং অফিসারের কাজে ন্যায়নীতিবোধ থাকলে চলে না, আমিও কখনও ওসব নিয়ে ভাবিনি।

**প্রশ্ন ঃ** সেনাবাহিনী অথবা মেরিনবাহিনীতে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে পেন্টাগণ কর্মপ্রার্থীদের যোগ্যতা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায় না। কথাটা কি ঠিক?

**উত্তর ঃ** রিক্রুট করার নিয়ম কানুন আমেরিকায় সহজ করে দেওয়া হয়েছে, কারণ আমেরিকার কেউই এখন সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চায় না। সেজন্য যারা এমনকী ক্রিমিনাল, গুরুতর অপরাধে যাদের এক বছর কারাদণ্ড পর্যন্ত হয়েছে, তারাও মার্কিন সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারে; অন্যদিকে হাইস্কুলের গণ্ডি পার হয়নি এমন যুবকদের জন্যও দরজা খোলা।

**প্রশ্ন ঃ** যুদ্ধের পর আপনি পাল্টে গিয়েছেন, কিন্তু আপনার পূর্বেকার অনুভূতিগুলির কথা বলতে পারেন?

**উত্তর ঃ** অন্যান্য সৈন্যদের মতোই ছিলাম, কোন্ কথায় বিশ্বাস করব, কোন্টা করব না, তারও নির্দেশ দেওয়া থাকত, সেটাই মেনে চলতাম। রিক্রুটিং অফিসারের কাজ শুরু করার পর আমার খারাপ লাগত, কারণ আমাকে সর্বদা মিথ্যা কথা বলতে হত।

**প্রশ্ন ঃ** কিন্তু আপনি তো বিশ্বাস করতেন যে, ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকা ন্যায়যুদ্ধ চালাচ্ছে?

**উত্তর ঃ** হ্যাঁ, তাই মনে করতাম। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, সাদ্দামের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে। পরে আমরা দেখলাম সবটাই মিথ্যা। ২০০৪ সালের মার্চ মাসে ইরাকে পৌঁছাবার পর আমার অধীনস্থ বাহিনীকে এমন জায়গাগুলিতে যেতে বলা হল যা পূর্বে ইরাকি সেনার দখলে ছিল। সেখানে আমরা অস্ত্রভরা হাজার হাজার বাক্স দেখতে পাই — যার উপর লেখা 'মেড ইন্ ইউএসএ' অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি। ইরানের বিরুদ্ধে ইরাকের যুদ্ধের সময় এইসব অস্ত্র আমেরিকা দিয়েছিল ইরাককে। আমি ছিলাম স্টাফ সার্জেন্ট, আমার অধীনে ছিল ৪৫ জন মেরিন সেনা। আমরা বুঝতেই পারিনি, আমেরিকার গোলাবারুদ কেন ইরাকের দখলে এসেছিল? সি আই এ রিপোর্টে বলা হয়েছিল, আমরা যেখানে যাচ্ছিলাম, সেই 'সালমন পার্ক' হচ্ছে সন্ত্রাসবাদীদের একটি ঘাঁটি যেখানে বিপুল পরিমাণে রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্র মজুত করা হয়েছে। কিন্তু আমরা সেখানে কিছুই পাইনি। তখনই আমি ভাবতে ও বুঝতে শুরু করি যে, আমাদের ইরাক অভিযানের মূল লক্ষ্য — তেল।

**প্রশ্ন ঃ** আপনার বইয়ের ভয়ঙ্কর জায়গাটা হচ্ছে যেখানে আপনি নিজেকে একজন মনোবিকারগ্রস্ত খুনি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। একথা আপনি কেন বললেন?

**উত্তর ঃ** আমি একজন মনোবিকারগ্রস্ত খুনি ছিলাম, কারণ আমাকে খুন করারই ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। ঐ মানসিকতা নিয়ে আমি জন্মাইনি। মার্কিন মেরিনবাহিনীই আমাকে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে একজন গুন্ডা, একজন ক্রিমিনাল বানিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের অর্ডার পূরণ করার জন্যই তারা আমাকে ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করেছে, যাতে তাদের হুকুম মতো আমি কাজ করে যাই, আমার বিবেক মনুষ্যত্ব নিয়ে মাথা না ঘামাই। আমি একজন মনোবিকারগ্রস্ত লোক ছিলাম। কারণ, আমাদের ট্রেনিংই দেওয়া হয়েছিল যাতে আমরা কাউকে দেখামাত্রই গুলি চালাই, প্রশ্ন করে উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করি — যেমনটা উন্মাদ মানুষ করে থাকে। পেশাদার সৈন্যরা কিন্তু এমন আচরণ করে না। নারী ও শিশুদের হত্যা করার সময়ও আমরা এক মুহূর্ত ভাবতাম না, গুলি চালিয়ে দিতাম। ফলে, আমরা সৈন্য নয়, ভাড়াটে খুনি ছিলাম।

**প্রশ্ন ঃ** আপনি মেশিনগান দিয়ে মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতেন?

**উত্তর ঃ** হ্যাঁ করতাম। আমাদের দেখে যদি অতি দ্রুত তারা চলে না যেত, অথবা আমাদের হুকুমের কোনও উত্তর না দিত, আমরা গুলি চালিয়ে দিতাম। ভাষা বোঝা যে সমস্যা, একথা ভেবেই দেখা হয়নি। আমাদের বলে দেওয়া হয়েছিল, মোটর গাড়ির যাতায়াত দেখলেই বুঝবে বিস্ফোরণ ঘটবে। তাই আমরাও গাড়ি দেখলেই বুলেটে ঝাঁঝরা করে দিয়েছি। কিন্তু এধরনের গাড়ি খুলে ভিতরে কখনও সন্ত্রাসবাদী ও আলকায়দার প্রচারপত্র পাইনি। নিহত-আহত নারী শিশু ও বেসামরিক মানুষের দেখা পেয়েছি। বুঝেছি অসময়ে ভুল জায়গায় তারা এসে পড়েছিল।

**প্রশ্ন ঃ** কীভাবে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপর আপনার বাহিনী বা অন্যরা মেশিনগান চালিয়েছে, বইয়ে তারও বর্ণনা দিয়েছেন। একথা কি সত্য?

**উত্তর ঃ** হ্যাঁ ঠিক। বাগদাদের দক্ষিণে, টাইগ্রিস নদীর কাছে রশিদ মিলিটারি কমপ্লেক্স-এর আশেপাশে একদল মানুষ খুবই শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে একদল যুবকও সেখানে ছিল। আমরা যখন সেদিকে এগোচ্ছিলাম, দেখলাম আমাদের একটা ট্যাঙ্ক রাস্তার একধারে দাঁড় করানো আছে। আমাদের ড্রাইভার বলল, ওরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। ওদের যদি কোন হিংস্র মতলব থাকত, তবে প্রথমেই ওরা আমাদের ট্যাঙ্ককেই উড়িয়ে দিত, কিন্তু সেটা ওরা করেনি। আমরা ওই মানুষগুলির থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে ছিলাম।

**প্রশ্ন ঃ** শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে গুলি চালাবার অর্ডার কে দিয়েছিল?

**উত্তর ঃ** উচ্চতর কর্তৃপক্ষ দিয়েছিল, পাশাপাশি সিআইএ বলেছিল ওরা সন্ত্রাসবাদী।

**প্রশ্ন ঃ** আপনারা কী করলেন?

**উত্তর ঃ** আমি হামভি গাড়িতে ফিরে যেতে যেতেই শুনলাম গুলি চলছে, আমিও শুরু করে দিলাম। যাদের গুলি করছিলাম, তাদের মুখের দিকে তাকাইনি, শুধু তাদের অস্ত্রগুলো খুঁজছিলাম। কিন্তু কিছুই পাইনি।

**প্রশ্ন ঃ** আপনার অধীনস্থ অন্য মেরিন সেনারা যখন জানল, তাদের মিথ্যা বলে ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে, তারা কী বলল?

**উত্তর ঃ** তারা ক্ষিপ্ত হয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল — কেন আমরা নির্দোষ মানুষদের হত্যা করলাম।

আমাদের যখন কারবালা শহরে যেতে বলা হয়, আমরা ভেবেছিলাম, ওখানকার মানুষকে খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য দিতেই বোধহয় আমাদের পাঠানো হবে। কিন্তু তার বদলে আমরা টানা ২৪ ঘন্টা ধরে ঐ শহরে বোমা মেরে গেলাম। এভাবেই আমরা ইরাকি তেল ভাণ্ডারের দিকে এগোচ্ছিলাম।

কুয়েতে আমরাই প্রথম পৌঁছাই, আমাদের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ খাবার ও মেডিকেল সরঞ্জাম ছিল। জায়গা না থাকায় আমি আমার উর্ধ্বতন অফিসারকে জিজ্ঞেস করি — আমরা তাহলে কী করব? তিনি সমস্ত মালপত্র নামাতে বললেন। এর কিছু পরেই হুকুম দিলেন, খাবার ও মেডিকেল সরঞ্জাম ইত্যাদি সব পুড়িয়ে দাও। এরপর ইরাকে চলে যাওয়ার নির্দেশ এল।

**প্রশ্ন ঃ** ইরাকে অস্ত্র হিসাবে ইউরেনিয়াম বর্জ্য ব্যবহারের জন্যও তো আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা করেছেন ?

**উত্তর ঃ** আমার বয়স এখন ৩৫ এবং আমার ফুসফুসের ক্ষমতার ২০ শতাংশেরও বেশি এর মধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে। আমার পিঠের হাড়ে সর্বক্ষণ ব্যথা করে, আমার প্রজনন ক্ষমতা নিয়েও আরও অনেকের মতো আমি ভীত। আমার মুখ সর্বদা ফোলা, ইরাক থেকে ফেরার পর আমার যে ছবি তোমরা দেখেছ, তাতেও আমাকে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতো দেখাচ্ছে। ইরাকে আমেরিকার দ্বারা ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম বর্জ্যই এর কারণ। ইরাকের মানুষের অবস্থাটা কল্পনা করতে পারো ? কী হবে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ?

**প্রশ্ন ঃ** আপনি আমেরিকায় ফিরে আসার পর কী ঘটল ?

উত্তর ঃ তারা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করল যেন আমি একজন খ্যাপাটে লোক। আমি যেন ভয়ে পালিয়ে এসে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। উর্ধ্বতন অফিসাররা সকলকে বলে দিল যে, আমি যা বলছি, সব মিথ্যা, বানানো। অথচ মার্কিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। ইরাকে মার্কিন সেনাবাহিনী শেষ হয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ যত দীর্ঘ হবে, ততই আমি ও অন্যান্যরা যে সত্যগুলি বলছি, সেগুলি বাইরের দুনিয়া বেশি বেশি করে জানার সুযোগ পাবে।

**প্রশ্ন ঃ** আপনার এই বইটি স্প্যানিশ ও ফরাসি ভাষায় আপনি ভেনেজুয়েলা থেকে প্রকাশ করেছেন। আমেরিকা থেকে ইংরেজি ভাষায় কেন প্রকাশ করলেন না ?

উত্তর ঃ মার্কিন প্রকাশক সংস্থাগুলির দাবি ছিল, প্রশাসনের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ, যুদ্ধাভিজ্ঞ বিভিন্ন ব্যক্তিদের মতামত ইত্যাদি যা আমি বইতে উল্লেখ করেছি, তা কেটে বাদ দিতে হবে। নানা বিতর্ক ও হামলার ভয়ও তাদের ছিল।

আপনি তো জানেন, ইরাকে থাকার সময় আমি যত ছবি তুলেছিলাম, আমেরিকায় ফেরার পর আমার সেই সমস্ত ছবিগুলি কেড়ে নেওয়া হয়। শুধু দু'টি হাতিয়ার নিয়ে আমি ঘরে ফিরেছিলাম — আমার ছুরি ও আমার মন।

**প্রশ্ন ঃ** আপনি কি মনে করেন, ইরাক যুদ্ধের কোনও দ্রুত সমাধানসূত্র রয়েছে ?

উত্তর ঃ না, আমি তা মনে করি না। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের নীতিগুলো একই। দু'টি দলই আমেরিকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিলিটারি কমপ্লেক্স-এর ওপর নির্ভরশীল। আমাদের একটি তৃতীয় দল দরকার।

**প্রশ্ন ঃ** কোন্ দল?

উত্তর ঃ দি পার্টি অফ সোস্যালিজম — সমাজতান্ত্রিক দল।

**প্রশ্ন ঃ** মার্কিন মেরিনরা কোন্ গান গায়?

উত্তর ঃ 'মন্টেজুমার হল থেকে ত্রিপোলির তটভূমি পর্যন্ত ...'

**প্রশ্ন ঃ** এর অর্থ কি এটাই যে, মার্কিন মেরিনরা বিশ্বের সকল অংশে পা রাখতে চায় ?

উত্তর ঃ তাদের স্বপ্ন সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করা — সেই চেষ্টায় আমরা সকলে যদি খুনিতে পরিণত হয়ে যাই, কিছু যায় আসে না।

(টেসটিমনি অফ এ ইউ এস এক্স-মেরিন — রোজা মিরিয়াম এলিজালদে, নর্থস্টার কম্পাস, ফেব্রুয়ারি ২০০৮ থেকে)

**মুর্শিদাবাদ**

# অ্যাবেকার পথ অবরোধ

সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা শাখার সম্পাদক জহরলাল পালের নেতৃত্বে নেতাজি মোড়ে শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক ১৭ এপ্রিল দুপুর ১২টা থেকে আধ ঘন্টা পথ অবরোধে সামিল হন। পথচলতি সাধারণ মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কর্মসূচিতে যোগদান করেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য মইনুদ্দিন সরকার। রাজ্য সরকার বিদ্যুতে অধিক মুনাফা লাভের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে লোডশেডিং করে যেভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা থেকে আরম্ভ করে অসুস্থ মানুষদের প্রবল অসুবিধায় ফেলছে এবং বোরোধানের চাষের যে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে, সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সংগঠনের শাখা সভাপতি নিখিলকৃষ্ণ কবিরাজ ঠাকুর। অন্যান্য বক্তারা হলেন শাখা সম্পাদক জহরলাল পাল, আব্দুর রৌফ, ইস্তাক আহমেদ, আনারুল হক, জয়চাঁদ মণ্ডল, জালেপ হোসেন প্রমুখ।

# এতই যদি গ্রামীণ উন্নয়ন, তবে বিদ্যুৎ কেনার পয়সা নেই কেন মানুষের?

পঞ্চায়েত ভোটের মুখে সিপিএম নেতারা যখন, তাঁদের আমলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলির কত উন্নয়ন হয়েছে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কত বেড়েছে তার অঢেল ফিরিস্তি দিবারাত্র শোনাতে ব্যস্ত, তখন মিথ্যা প্রচারের সেই ঢাক ফাঁসিয়ে দিয়ে গেলেন, আর কেউ নয়, কেন্দ্রে তাঁদেরই বন্ধু সরকারের বিদ্যুৎমন্ত্রী জয়রাম রমেশ। ১৮ এপ্রিল কলকাতা সফরে এসে তিনি গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের এমন সব তথ্য ফাঁস করে দিয়ে গেছেন, যা অস্বীকার করার উপায় সিপিএম নেতাদের নেই।

'উন্নততর' সিপিএম-ফ্রন্টের শাসনে পশ্চিমবঙ্গের অতি উজ্জ্বল উন্নয়নের ছবি, রাস্তার দু'ধারে সরকারি বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংগুলিতে সবসময় জ্বলজ্বল করে। এসব বিজ্ঞাপনে কারখানার শ্রমিক, কাস্তে হাতে চাষী, কৃষক রমণীর হাসিমুখ আর বইপত্র হাতে স্বাস্থ্যবান গ্রামীণ শিশুদের ছবি দেখলে মনে হয়, গ্রামবাংলার মানুষ কত সুখেই না আছে ! বাস্তবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে মানুষ কতখানি আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে আছে, তা স্পষ্ট হয়ে গেছে জয়রাম রমেশের কথায়। তিনি জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ পরিবারগুলির মাত্র ২১ শতাংশের বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। অর্থাৎ বাকি ৭৯ শতাংশ পরিবারেরই একমাত্র ভরসা দিনের আলো এবং কেরোসিনের লম্ফ। যদিও সরকারি হিসাবের এমনই কৌশল যে, কোনও গ্রামের মাত্র ১০ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ থাকলেই গোটা গ্রামটির বিদ্যুতায়ন হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এ ভাবে হিসেব করলে দেখা যাবে, রাজ্যের ৩৮ হাজার গ্রামের মধ্যে ৩১ হাজার ৭৬০টিতেই বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। বাকি আছে মাত্র ৬ হাজার ২৪০টি গ্রাম। কিন্তু সরকারি হিসেব মতো বেশিরভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো সত্ত্বেও এইসব গ্রামের অধিকাংশ পরিবার বিদ্যুৎ ছাড়াই জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।

গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের কেন এই দুরবস্থা? রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ সচিব নিজেই এর কারণ হিসাবে দারিদ্রকে দায়ী করেছেন । ১৭ এপ্রিল এক আলোচনাসভায় তিনি জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার আর্থিক সামর্থ্য যাঁদের ছিল, তাঁদের বেশিরভাগই তা নিয়ে নিয়েছেন। যাঁরা সংযোগ নিতে পারেননি, বাস্তবে তাঁদের বিদ্যুৎ কেনার মতো পয়সাই নেই (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮-৪-০৮)।

বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা গ্রামবাংলায় কতজনের আছে? বিদ্যুৎ সচিব জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের মোট গ্রামীণ পরিবারের মাত্র ৩২ শতাংশের এই সামর্থ্য আছে। অবশিষ্ট বিপুল সংখ্যক মানুষের পক্ষে মাসের শেষে বিদ্যুতের বিল মেটানো সম্ভব নয়। তাই বিদ্যুৎ ছাড়াই দিন কাটাতে বাধ্য হন রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ। দিনের আলো ফুরোবার আগেই যাবতীয় কাজ সেরে ফেলতে হয় তাঁদের। রাতের অন্ধকারে নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কেরোসিনের লম্ফ বা লণ্ঠনও জ্বালাতে পারেন না তাঁরা। কারণ কেরোসিনও আজ মহার্ঘ। যেহেতু অল্প অল্প করে প্রয়োজন মতো তা কেনা যায়, তাই সন্ধ্যার পর কেরোসিনই তাঁদের একমাত্র ভরসা।

কিন্তু এ কী বলছেন বিদ্যুৎ সচিব! তবে যে নেতা-মন্ত্রীরা অহরহ বলে বেড়াচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলি উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে! গ্রামের মানুষের হাতে এখন এত পয়সা যে শিল্পপণ্য কেনার জন্য রীতিমতো বিরাট এক বাজার তৈরি হয়েছে! তবে কি তা ছিল সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের মিথ্যা প্রচার ? বিদ্যুৎ সচিবের কথা থেকেই তা পরিষ্কার হয়ে গেল না কি?

বিদ্যুৎ সচিব জানিয়েছেন, এ রাজ্যের মোট ১ কোটি ১২ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছে মাত্র ৩৬ লক্ষ পরিবার। তিনি এ-ও বলেছেন, বিদ্যুতায়নের জন্য কেন্দ্রীয় যোজনার অর্থ খরচ করে বাকি পরিবারগুলিতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় গ্রাহক পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু শুধু তথ্য জানালেই তো চলবে না, সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে জবাব দিতে হবে, একুশ শতকের এই যুগে, সভ্যতার প্রাণ বিদ্যুৎ কেন আজও এত মানুষের নাগালের বাইরে। যে সিপিএম সরকার রাজ্যের উন্নয়নের এত ঢাক পেটায়, কম্পিউটারনির্ভর আই টি সেক্টরকে দেখিয়ে আধুনিকতার বড়াই করে, সেই সরকার কেন রাজ্যের এতগুলি মানুষকে আজও অন্ধকারে থাকতে বাধ্য করছে? জবাব দিতে হবে, বড় বড় শিল্পপতি, পুঁজিমালিকদের জন্য যে সরকার বিদ্যুতের বিলে অফুরন্ত ছাড় দিয়ে চলেছে, সেই সরকার কেন সাধারণ মানুষের জন্য বিদ্যুতে ছাড় দেয় না, যাতে অধিকাংশ মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারে? এ সরকার তাহলে কাদের সরকার ? মুখে বামপন্থার কথা বলে, মার্কসবাদের বুলি আউড়ে কোন্ শ্রেণীর স্বার্থে এই সরকার কাজ করছে — এ প্রশ্নের জবাবও দিতে হবে।

একটি দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান কতটা উন্নত, সাধারণভাবে তা পরিমাপের একটি মাপকাঠি হল বিদ্যুতায়ন। দেশের কত শতাংশ পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে, তা দিয়ে একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝা যায়। এই হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের কী হাল, কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ সচিব — এই দু'জনের বক্তব্য থেকেই তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাঁদের বক্তব্য থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, সিপিএম সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা উন্নয়নের যত ঢাকই পেটান না কেন, এ রাজ্যের খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের উজ্জ্বল হাসিমুখগুলির দেখা মেলে কেবল সরকারি বিজ্ঞাপনের ছবিতে, বাস্তবে নয়।

বস্তুত, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যে তীব্র সংকটে গোটা বিশ্বের দেশগুলি আজ চরম সংকটগ্রস্ত, ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ সেই সংকটের বাইরে নয়। এই অবস্থার মধ্যেও যেটুকু 'রিলিফ' একটি সরকার সাধারণ মানুষকে দিতে পারে, এ রাজ্যের সিপিএম সরকার সে জাতের নয়। তারা পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবাতেই নিবেদিতপ্রাণ। কর-দর-মূল্যবৃদ্ধির বোঝায় মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। গ্রামে গ্রামে তীব্র বেকার সমস্যা, জলসেচ ব্যবস্থা অপ্রতুল হওয়ায় চাষের সমস্যা, ঋণের বিপুল বোঝা, ফসলের দাম না পাওয়া — ইত্যাদি অসংখ্য সমস্যায় গ্রামের মানুষ জর্জরিত। তারা দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোগাড় করতেই হিমশিম খাচ্ছে। এই অবস্থায় ঘরে বিজলি বাতি জ্বালিয়ে রাতের অন্ধকার দূর করা গ্রামবাংলার মানুষের কাছে এখনও স্বপ্নের অতীত।

# দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি পরীক্ষায় নৈরাজ্য

**প্রশ্ন ফাঁস** — ১.০৪.০৮ তারিখে দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা পরীক্ষা ছিল। হাওড়ার উলুবেড়িয়ার পূর্ব চক্রের খাসখামার বোর্ড প্রাইমারি স্কুলে বাংলা প্রশ্নপত্রের প্যাকেটে ইংরেজি প্রশ্নপত্র পাওয়া যায়। (সূত্র ঃ বর্তমান ২.০৪.০৮)।

যথারীতি এই প্রশ্নপত্রেই পরদিন ইংরেজি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে।

**মহাজন উবাচ ঃ** এই প্রশ্ন ফাঁস সম্পর্কে পরীক্ষা গ্রহণকারী প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের শীর্ষকর্তা, পর্ষদ সভাপতি অধ্যাপক শূলপাণি ভট্টাচার্যের মন্তব্য — খুব একটা ক্ষতি হয়নি; পাশ-ফেল তো নেই। (সূত্র ঃ দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান ৪.৪.০৮)

৭.৪.০৮ তারিখে ছিল তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজি পরীক্ষা। তার অনেক আগে থেকে ইংরেজি প্রশ্নপত্র হাতে হাতে ঘুরেছে (সূত্র ঃ দৈনিক স্টেটসম্যান ৪.৪.০৮)।

**প্রশ্নপত্র কম** — গোলমাল ঃ ২.৪.০৮ তারিখে দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজি পরীক্ষার দিনে শিলিগুড়ির ভারতনগরের জগদীশ বিদ্যাপীঠে ১০২টি প্রশ্নপত্র যাওয়ার কথা। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ পান ৯৩টি প্রশ্ন। ৬টি প্রশ্নপত্র সাদা ছিল।

আর একটি স্কুলে (হিন্দি মাধ্যম) ইংরেজি-হিন্দি প্রশ্ন যাওয়ার কথা। গেছে ইংরেজি-বাংলা প্রশ্ন।

কী অদ্ভুত! এর নাম পরীক্ষা?

এ ছাড়া প্রশ্নপত্র ও নির্দেশিকায় নানারকম গোলমাল ছিল। বিশেষত তৃতীয় শ্রেণীর ইতিহাস, প্রকৃতি বিজ্ঞান ইত্যাদি প্রশ্নে চরম বিভ্রান্তি। অনেক জায়গায় উত্তর বলে দেওয়া হয়েছে। আবার বহু জায়গায় দেখা গেছে, বলে দেওয়া সত্ত্বেও লিখতে পারছে না। তখন ভাল ছাত্রের খাতা দিয়ে দেখে লিখতে বলা হয়েছে। এ রকম অসংখ্য ঘটনা রয়েছে।

কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এই পরীক্ষার সার্থকতা কিছু আছে কি?

(সূত্র ঃ প্রাথমিক শিক্ষকের বার্তা, ২৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা)

# সিপিএমের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতার নেপথ্য কাহিনী

চারের পাতার পর

সিপিএমের পক্ষ থেকে কংগ্রেস, নকশাল এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ছ'জন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী এবং একজন পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থীর প্রস্তাবকদের সই নকল করা হয়েছে বলে আমার কাছে অভিযোগ করা হয়েছিল। আমি এই সাতজন প্রস্তাবকের সই পরীক্ষা করে কোনও ভুল পাইনি।

**কালিয়াগঞ্জে কংগ্রেস প্রার্থীর স্ত্রী ও ছেলেকে রাস্তায় ফেলে পেটাল সিপিএম**

(বর্তমান, ১৬-৪-০৮)

পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেসের প্রার্থী হওয়ায় উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জের ভুঁইহারা গ্রামের বাসিন্দা সন্তোষ বিশ্বাসের স্ত্রী ও পুত্রকে রাস্তায় ফেলে সিপিএমের সমর্থকরা বেধড়ক পিটিয়েছে বলে কংগ্রেস অভিযোগ করেছে। সোমবার রাতে ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে থানায় ডায়েরি দিতে এলে উল্টে অভিযোগকারীদেরই কয়েক ঘণ্টা থানায় বসিয়ে হেনস্থা করা হয়।

গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে গতবার সন্তোষবাবু কংগ্রেসের হয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে জিতেছিলেন।

তাঁর ছেলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছোটন জানায়, রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ মামাবাড়ি যাওয়ার পথে গ্রামেরই ৭-৮ জন লোক আমাকে জিজ্ঞেস করেন, কোথায় যাচ্ছিস? এরপর আর কোনও কথা না বলে তারা আমাকে মারতে শুরু করে। আমি রাস্তায় পড়ে যাই। বাড়ির সামনেই ওরা আমাকে মারছিল। আমার চিৎকার শুনে মা এগিয়ে এলে তাঁকেও মারধর করা হয়। প্রতিবেশীরা এসে আমাদের উদ্ধার করেন। এই ঘটনার পর এলাকার কংগ্রেস কর্মীরা আতঙ্কে ভুগছেন।

**নদীয়ায় তৃণমূল প্রার্থীদের পিটিয়ে নাম তুলে নিতে বলছে সিপিএম**

(বর্তমান, ১৭-৪-০৮)

মঙ্গলবার রাতে কোতোয়ালি থানার চকদিগনগর এবং ধুবুলিয়ায় সিপিএমের বাহিনী তৃণমূল প্রার্থীদের বেধড়ক মারধর করেছে। চকদিগনগরের ঘটনায় তৃণমূল প্রার্থী সহ তাঁর তিন আত্মীয় গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সিপিএমের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী আরএসপি-র প্রার্থীদেরও নানাভাবে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ।

ধুবুলিয়া থানার বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা লতিকা ঘোষ এবার গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে সিপিএমের মস্তানরা তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়ে মারধর করে। মস্তানরা তাঁকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য হুমকি দিয়ে যায়।

রানাঘাটের আরএসপি নেতা রমেশ সেনের অভিযোগ, মঙ্গলবার মুড়াগাছা এলাকার কেটু দাস রানাঘাট-২ ব্লক অফিসে মনোনয়ন জমা দিতে এলে সিপিএমের মস্তানরা তাঁকে খুনের হুমকি দিয়ে অফিস থেকে বের করে দেয়। রানাঘাটের পায়রাডাঙায় সিপিএম তাঁদের দুই প্রার্থীকে মঙ্গলবার দিনভর আটকে রেখে প্রার্থীপদ দাখিল করতেই দেয়নি।

**সবং, শাসন, খানাকুল, বাসন্তীতে বিরোধী প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার করাতে সন্ত্রাস সিপিএমের**

(বর্তমান, ১৭-৪-০৮)

সবং-এ অধিকাংশ কংগ্রেস প্রার্থী সিপিএমের অত্যাচারে গ্রামের বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছেন। বারাসতের শাসনে মজিদ মাস্টারের বাহিনী টাটা সুমোতে চড়িয়ে এক সঙ্গে চার তৃণমূল প্রার্থীকে বিডিও অফিসে নিয়ে গিয়ে নাম প্রত্যাহার করিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আরামবাগের খানাকুলে বিরোধী দলের প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার করিয়ে সিপিএমের সশস্ত্র মিছিলে তাঁদের হাঁটানো হয়েছে। রেহাই পাচ্ছে না বামফ্রন্টের শরিকরাও। বাসন্তীতে আরএসপির তিন প্রার্থী গ্রামছাড়া হয়েছেন।

সবংয়ের বিভিন্ন গ্রামে সিপিএমের মোটরবাইক বাহিনী ঘুরে ঘুরে কংগ্রেস নেতা এবং প্রার্থীদের আক্রমণ করেছে। সনৎ সেনগুপ্ত নামে এক কংগ্রেস নেতাকে টাঙ্গি দিয়ে তারা মাথায় আঘাত করে। গভীর রাত পর্যন্ত রক্তাক্ত এবং অচৈতন্য অবস্থায় সনৎবাবু পড়েছিলেন। পুলিশ বসেছিল সিপিএমের পার্টি অফিসে।

বারাসতে মজিদ মাস্টারের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী, শাসনে তৃণমূল প্রার্থীদের বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে সাদা কাগজে নাম প্রত্যাহারের কথা লিখিয়ে নিচ্ছে। সোমবার বিকালের মধ্যে সব বিরোধী প্রার্থীকে সরে দাঁড়াতে ফতোয়া দিয়েছে তারা।

**সন্ত্রাসের ভয়ে পঞ্চায়েতে বিরোধী দলের প্রার্থী হতে চাইছেন না অনেকেই**

(বর্তমান, ১৫-৪-০৮)

এসডিও অফিসে না হয় মনোনয়নপত্র পেশ করা গেল, কিন্তু তারপর সিপিএমের ক্যাডারদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার গ্যারান্টি কে দেবে?

১৫টি ব্লকের মনোনয়নপত্র দাখিলের কাজ বিডিও-র বদলে এসডিও অফিসে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

বিরোধীদের অভিযোগের ভিত্তিতে ১৫টি ব্লককে কার্যত উপদ্রুত ঘোষণা করেছে প্রশাসন। কিন্তু কয়েকদিন ধরে সিপিএমের হামলা-হুমকি মাত্রা ছাড়িয়েছে। তার ফলে ওইসব জায়গায় তৃণমূল এবং কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থীরা অনেকেই বেঁকে বসেছেন।

# ২৪ এপ্রিল ঃ জেলায় জেলায় সভা

একের পাতার পর

চ্যানেল প্রায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। এই দিনটিকে ভিত্তি করে দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে কী গভীর আবেগ কাজ করে, এদিনের সমাবেশ তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বহু পুরনো ও প্রবীণ কর্মী, বয়সের ভার উপেক্ষা করে এদিনের সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন। এস ইউ সি আই-এর সভা হচ্ছে দেখে শত শত পথচলতি মানুষও সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুনেছেন। গোটা সভাস্থল ঘিরে ছিল পূর্ণ নীরবতা। সকলেই যে দলের বক্তব্য শুনতে এসেছেন, চোখ-মুখেই তার প্রতিফলন ছিল।

সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটি ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। এছাড়াও মঞ্চে ছিলেন রাজ্য কমিটি ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সাধনা চৌধুরী।

প্রধান বক্তা কমরেড সৌমেন বসু বলেন, একটি শ্রেণীবিভক্ত পুঁজিবাদী দেশে শাসক-শোষক শ্রেণী যেমন শোষণের স্বার্থ বহাল রাখার জন্য নিজস্ব দল গড়ে, তেমনই সর্বহারাশ্রেণীকেও শাসক-শোষক শ্রেণীর দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তিকে উচ্ছেদ করে গোটা সমাজকে শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য নিজেদের দল গড়তে হয়। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, আদর্শ ও সংঘবদ্ধ শক্তির ভিত্তিতে বিপ্লবী লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই সর্বহারা শ্রেণীর সঠিক বিপ্লবী দল একটি অপরিহার্য শর্ত। ভারতবর্ষে এই উপলব্ধি একদল তরুণ বিপ্লবীর মধ্যে ঘটেছিল পরাধীন ভারতেই। বিজ্ঞানভিত্তিক পথনির্দেশ ছাড়া শুধু আবেগ ও আত্মনিবেদন দিয়েই যে শোষণমুক্তি ঘটানো যাবে না,তার জন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী আদর্শ চাই, এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই তাঁরা যথার্থ বিপ্লবী দল গড়ার দুঃসাহসিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সে সময় ভারতবর্ষে সিপিআই, আর এস পি-র মতো দল ছিল, যারা নিজেদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলত, শক্তিও তাদের অনেক ছিল, অনেক সৎ ও আত্মনিবেদিত নেতা-কর্মীও ছিলেন। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে ৭-৮ জন তরুণ বিপ্লবী উপলব্ধি করেছিলেন যে, সিপিআই ও আর এস পি-র মতো দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে স্লোগান দিলেও ভারতবর্ষের মাটিতে তার বিশেষীকৃত প্রয়োগ ঘটাতে পারেনি এবং ঐ দলের নেতা-কর্মীরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে নিজেদের জীবনকেও গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি।

এই তরুণ বিপ্লবীরা এ কথাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, স্বাধীনতার পরে ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণী যদি ক্ষমতা দখল করে, তাহলে জনগণ কিছু খণ্ডিত রাজনৈতিক অধিকার পেলেও অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে না। ব্রিটিশ শাসনের চেয়েও শোষণ বাড়বে। মানুষ আরও নিঃস্ব হবে। গণতান্ত্রিক অধিকারও ধীরে ধীরে লোপ পাবে। শুধু তাই নয়, মানুষের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা, সত্য বোঝার চেতনা ধ্বংস করার জন্য নৈতিকতা, মনুষ্যত্বকেও পুঁজিবাদ ধ্বংস করবে। কিছু দল আন্দোলনের নামে মহড়া দেবে, ভোট কব্জা করার জন্য জনগণের মিত্র সাজবে, ভোটের মধ্য দিয়ে একদলের পরিবর্তে আরেক দল ক্ষমতায় আসবে, কিন্তু শোষিত মানুষের জীবনে শোষণ-জুলুম বাড়তেই থাকবে। এর থেকে যদি ভারতীয় সমাজকে মুক্ত করতে হয়, তাহলে তার জন্য প্রথম দরকার শ্রমিকশ্রেণীর একটি যথার্থ বিপ্লবী দল। এই উপলব্ধি থেকেই কমরেড শিবদাস ঘোষ এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠা করেন। সেদিন তাঁকে কেউ চিনত না, জানত না, আশ্রয়, খাদ্যের কোনও সংস্থান ছিল না, বড় বড় দলগুলো ক্রমাগত বিদ্রূপ করেছে, কথা বলতে চায়নি, কিন্তু কোনও কিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি। এস ইউ সি আই-কে গড়ে তোলার অদম্য প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি সংগ্রাম করেছেন। পার্টির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের পথে তিনি কালক্রমে একজন মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তানায়কে পরিণত হয়েছেন, যাঁর চিন্তা আজ কেবল ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকৃত কমিউনিস্টদের আকৃষ্ট করছে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, রাজনীতি উচ্চ হৃদয়বৃত্তি, বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। তিনি বলেছেন,উন্নত সাংস্কৃতিক মান অর্জন করা ছাড়া উন্নত কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। তাঁর এই শিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই এস ইউ সি আই আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতবর্ষের ২২টি রাজ্যে কাজ করছে। এস ইউ সি আই-এর সংগ্রামী ভূমিকা এবং নেতা-কর্মীদের উন্নত আচার-আচরণ দেখেই আজ মানুষ এস ইউ সি আই-কে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করেন। রাজনীতি সম্পর্কেই যখন আজ মানুষের মধ্যে প্রবল ঘৃণা, রাজনীতি ও দুর্নীতি, মানুষের কাছে যখন প্রায় সমগোত্রীয় হয়ে গিয়েছে, তখন এস ইউ সি আই সম্পর্কে মানুষের কী গভীর আবেগ — যা আমাদের প্রেরণা দেয়, নিজেদের আরও দায়িত্বশীল হতে উৎসাহ জোগায়।

শোষিতশ্রেণীর যথার্থ বিপ্লবী দল বলেই এস ইউ সি আই-এর ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চলছে। গণআন্দোলনে কর্মীরা শহীদ হচ্ছেন, সিপিএমের আক্রমণে কমরেড আমীর আলি হালদারের মতো প্রবীণ নেতা সহ ১৫১ জন নিহত হয়েছেন। কমরেড প্রবোধ পুরকাইত সহ ২৯ জনকে মিথ্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়েছে ওরা। শত শত কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে, তবুও দলের অগ্রগতি ওরা আটকাতে পারেনি।

কমরেড সৌমেন বসু বলেন, যে দেশেই সঠিক বিপ্লবী দল মানুষের স্বার্থ নিয়ে যথার্থ লড়াইয়ে এগিয়ে যায়, সেদেশেই শাসক-শোষকশ্রেণী সেই দলকে ধ্বংস করার জন্য বাইরে ও ভিতর থেকে আক্রমণ চালায়। আমরা জানি চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট নেতা জুলিয়াস ফুচিককে ওদেশের শাসকরা গুলি করে হত্যা করেছিল, এমনকী বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্টরা লেনিনকে গুলি করেছিল। যার থেকেই পরে তাঁর মৃত্যু হয়। স্ট্যালিনের সময়ে মস্কোতে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির হেড কোয়ার্টারের ভিতরে ঢুকে সাধারণ সম্পাদক কমরেড কিরভকে হত্যা করা হয়েছিল। কিউবার নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর ওপর কতবার যে আক্রমণের চক্রান্ত হয়েছে, তার হিসাব নেই। পুঁজিবাদী সমাজে একটি যথার্থ বিপ্লবী দলের ভিতরেও নেতা-কর্মীরা যদি ব্যক্তিগত ক্ষমতালিপ্সা, ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদির থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম না করেন, তবে তাঁদেরও ভেতর থেকে পচন হয়ে যেতে পারে।

তিনি বলেন, রাজতন্ত্র-সামন্ততন্ত্রকে ভেঙে পুঁজিবাদ যেদিন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঝান্ডা উড়িয়েছিল, সেদিন বুর্জোয়া মতাদর্শ বড় চরিত্র দিয়েছিল, বড় মানুষ সৃষ্টি করেছিল। আজ সেই বুর্জোয়া মতাদর্শ একজন মানুষকে শুধু অধঃপতিতই করতে পারে। কারণ, পুঁজিবাদ আজ প্রতিক্রিয়াশীল, ক্ষয়িষ্ণু, মরণোন্মুখ ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। আজ সেই পুঁজিবাদকে ভাঙবে যে সর্বহারাশ্রেণী, তার স্বার্থের পরিপূরক মতাদর্শই একমাত্র বড় চরিত্র, মহৎ রাজনৈতিক নেতা, বড় মানুষের জন্ম দিতে পারে। ফলে আজ সমাজে সর্বহারা সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চার প্রয়োজন। যার মূল কথা হল, সমাজকে পুঁজিবাদী শোষণজ্বালা থেকে মুক্ত করার স্বার্থ ছাড়া আমার জীবনে আর দ্বিতীয় কোনও স্বার্থবোধ নেই।

পরিশেষে তিনি বলেন, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনে সিপিএমের বীভৎস ফ্যাসিবাদী আক্রমণ বুঝিয়ে দিয়েছে, ভবিষ্যতে এ রাজ্যে গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে সিপিএম সরকার এই ধরনের আক্রমণই নামিয়ে আনবে। একে প্রতিরোধ করার জন্য ব্যাপক জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দরকার। এই লক্ষ্য থেকেই আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। পঞ্চায়েত নির্বাচনেও আমরা লড়াই করছি গণআন্দোলনের লক্ষ্যকেই সামনে রেখে। অমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ গণআন্দোলনের রাজনীতিকে শক্তিশালী করার জন্যই এগিয়ে আসবেন।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

**নদীয়া**

দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নদীয়া জেলাসদর কৃষ্ণনগরে ক্ষৌণীশ পার্কে একটি জনসভা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুজিত ভট্টশালী। সভাপতিত্ব করেন নদীয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কমল দত্ত।

তেহট্ট থানার পলশুন্ডা হাসপাতাল মাঠে একটি বড় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নদীয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মুসাবুদ্দিন মণ্ডল। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য নদীয়া জেলা সম্পাদক কমরেড সেখ খোদাবক্স।

করিমপুরের ধোড়াদহ বাস স্টপেজে একটি জনসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান কমরেড আলতাফ হোসেন, প্রধান বক্তা ছিলেন নদীয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জাকিমুদ্দিন সেখ। নারায়ণপুর অঞ্চলের জনসভায় সভাপতি ছিলেন কমরেড সিরাজ শাহ্। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বসির আহমেদ বক্তব্য রাখেন।

কালীগঞ্জ থানার দেবগ্রামে ২৪শে এপ্রিল বিকালে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে কালীগঞ্জ ও নাকাশীপাড়া থানার বহু মানুষ যোগ দেয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কোরবান আলী। প্রধান বক্তা ছিলেন নদীয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান।

**বীরভূম**

২৪শে এপ্রিল এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে বীরভূম জেলার রামপুরহাট রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হলে সকাল ১০টায় মুরারই, নলহাটী, লোহাপুর, রামপুরহাট ও মল্লারপুর এলাকার কর্মী-সমর্থক-দরদী জনসাধারণ এক সমাবেশে উপস্থিত হন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড রফিকুল হাসান এবং প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন মুখার্জী।

সিউড়ি, মহম্মদবাজার, দুবরাজপুর, রাজনগর, ময়ূরেশ্বরের কর্মী-সমর্থক-দরদীরা সিউড়ি শহরের সমাবেশে যোগদান করেন। সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য মহঃ কুদ্দুস আলী। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মদন ঘটক।

বোলপুর শহরের মাড়োয়ারী ধর্মশালায় প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক সমাবেশ হয়। সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই-এর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড শম্ভু ব্যানার্জী এবং প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড রতন মুখার্জী।

**পুরুলিয়া**

পুরুলিয়া জেলার ৮টি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় জনসভা এবং অন্য ৮ জায়গায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সাঁওতালডির জনসভায় জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেডস্ ভাস্কর ভদ্র এবং ডি কে মুখার্জী, ছড়া-লালপুরে জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য, মুরাডিতে জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কুশধ্বজ মণ্ডল, জয়পুরে জেলা কমিটির সদস্য কমরেড এম কে সিন্‌হা, নূতনডিতে জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বিজয় বাউরী, বাগমুণ্ডির শশ মোড়ে বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড সুবর্ণ কুমার, জনার্দনডিতে বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড অনিল বাউরী এবং চোরপাহাড়ীতে বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড বিনয় ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া আড়ষা, ঝালদা, পুরুলিয়া শহর, পুরুলিয়া মফঃস্বলের বোঙ্গবাড়ি,

আটের পাতায় দেখুন

দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৪ এপ্রিল কেরালার তিরুভাল্লা শহরে বিশাল সমাবেশের একাংশ

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09



# এস ইউ সি আই ও তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ী করুন

তিনের পাতার পর

ইন্সপেক্টার-সিপিএম নেতাদের চক্র রেশনিংয়ের চাল-গমের বিরাট অংশ বাইরে পাচার করে দিচ্ছে। বেশি দাম দিলে চাল-গম-নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য সবই পাওয়া যায়। মজুতদার-কালোবাজারিরা রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী নাকি মজুতদারদের কাউকে খুঁজে পাচ্ছেন না! কি করে পাবেন? তারা তো সিপিএমের ফান্ড যোগায়! এই হচ্ছে সিপিএম শাসনে গ্রামবাংলার বহু ঘোষিত উন্নয়নের চিত্র।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক ঘোষণা করছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন রক্তাক্ত হবে। তার মানে অতীতের সমস্ত নির্বাচন যেমন রক্তাক্ত হয়েছে, এবং সেটা সিপিএমই করেছে, এবারও হবে। হুমকি, মারধর প্রভৃতি শুরু হয়ে গেছে এবং এটা আরও বাড়বে। আমরা জনগণের কাছে আবেদন করব, যেখানেই সিপিএম আক্রমণ করবে, বুথ দখল করবে, এবং ভোটারদের ঘুষ দেওয়ার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করবে, জনগণ যেন সংগঠিত ভাবে তা প্রতিরোধ করেন। আমরা যেসব জায়গায় লড়ছি, সেখানে জনগণকে সংগঠিত করছি, ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলছি। যেভাবে জয়নগর-কুলতলি কেন্দ্রকে রক্ষা করে যাচ্ছি, সেভাবেই পঞ্চায়েত নির্বাচনেও জনগণকে সংগঠিত করেই আমরা লড়ব।

সর্বশেষে নন্দীগ্রাম বিষয়ে বলতে চাই, আমরা চেয়েছিলাম সেখানে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নামেই লড়া হোক। নন্দীগ্রামে যেহেতু দলমত নির্বিশেষে মানুষ, এমনকী সিপিএম-সিপিআই-কংগ্রেস-জমিয়তে উলেমা হিন্দের সমর্থক মানুষও ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নামে লড়াই করেছিল, তাই সেখানে এই কমিটির নামে লড়াই হোক এটা আমরা চেয়েছিলাম। দুঃখের কথা, আমরা তৃণমূল নেতৃত্বকে সেটা বোঝাতে পারিনি। আমরা সর্বত্রই কংগ্রেস এবং বিজেপির সঙ্গে সমঝোতার বিরুদ্ধে। তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের কথাই হয়েছিল, তাঁরা যতদিন কংগ্রেস এবং বিজেপির সঙ্গে সমদূরত্ব রেখে চলবেন, ততদিন তাদের সাথে আমাদের ঐক্য থাকবে।

কিন্তু নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে, ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে এত বড় সংগ্রাম হলো, কত মানুষ প্রাণ দিল, কত নারী নির্যাতিতা হলো, যার বিনিময়ে এক ঐতিহাসিক জয় এল, যা গোটা দেশে, সমগ্র বিশ্বে মানুষকে প্রেরণা দিচ্ছে, সেই কমিটির নামে — কোন দলের রঙ দেখে নয় — সেখানে সংগ্রামী প্রার্থীকে দাঁড় করালে জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে সাহসের সাথে নির্বাচনে সিপিএমের আক্রমণ মোকাবিলা করত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা বোঝাতে পারলাম না। এ অবস্থায় আমাদের দলের জেলা কমিটি নন্দীগ্রামের পঞ্চায়েত ভোটে অংশ না নেওয়ার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্বের অনুরোধে আমরা প্রতীকী লড়াই হিসাবে ১টি আসনে শুধু নন্দীগ্রামে লড়ছি।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, এস ইউ সি আই এবং তৃণমূল কংগ্রেসের এই জোট যাতে না থাকে তার জন্য একদিকে যেমন সিপিএমের আক্রমণ-চাপ আছে, কংগ্রেস-বিজেপির চাপ আছে, তেমনই ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসেরও প্রবল চাপ আছে। এস ইউ সি আই একটি বিপ্লবী দল, সংগ্রামী শক্তি, এটা সবাই জানে। আমাদের সঙ্গে তৃণমূলের শক্তি যুক্ত হয়ে যদি গণআন্দোলন হয়, তবে পশ্চিমবাংলায় গণআন্দোলনের চেহারাটাই অন্যরকম হয়ে যাবে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে। এটা ঐ সব শক্তির পক্ষে ভয়ের কারণ। আবার, কংগ্রেস থেকেই তৃণমূলের জন্ম। তৃণমূলের কিছু নেতার সাথে কংগ্রেসের এখনও যোগাযোগ আছে, বিজেপি-র সাথেও আরেক দলের আছে। এঁরাও আমাদের সাথে ঐক্য চান না। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের সাথে কথা বলে বুঝেছি, তাঁদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জী এবং সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়ের সাথেও কথা বলে মনে হয়েছে, তাঁরা আন্দোলনের স্বার্থে আমাদের সাথে ঐক্যের ক্ষেত্রে আন্তরিক। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে আমরা যুক্ত আন্দোলনে নামব, এই আশা রাখি।

**বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন কমরেড প্রভাস ঘোষ**

**সাংবাদিক ঃ** এ সব সত্ত্বেও আপনারা কি মনে করেন, নির্বাচনে সিপিএমের ফল খারাপ হবে, আর আপনাদের ফল ভালো হবে।

**প্রভাস ঘোষ ঃ** পাবলিক মুডটা পশ্চিমবাংলায় যা তৈরি হয়েছিল, এবং আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম সেভাবে আমরা এবং তৃণমূল যদি একটা পরিপূর্ণ বোঝাপড়ার ভিত্তিতে গণকমিটি গঠনের মাধ্যমে ঐক্যে আসতে পারতাম, তাহলে কিন্তু পশ্চিমবাংলায় সিপিএম পরাস্ত হত আমি বলছি না, একটা ধাক্কা দিতে পারতাম। সিপিএমের নিচু তলার বহু সৎ কর্মী-সমর্থক, যারা আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন, তারাও এটা চেয়েছিলেন। নির্বাচন এখনও বাকি আছে, প্রচারও বাকি আছে। কী দাঁড়ায় পরে বোঝা যাবে। এইটুকু বলতে পারি, পাবলিক মাইন্ড প্রবলভাবে অ্যান্টি সিপিএম। সিপিএম টাকা এবং থ্রেট ছাড়া জিততে পারবে না। জনগণেরপপুলার সাপোর্ট ওদের নেই।

**প্রশ্ন ঃ** আপনারা কি নির্বাচনে কেন্দ্রের সশস্ত্র বাহিনী চাইছেন?

**উত্তর ঃ** অবশ্যই। আমরা মনে করি মানুষ ভরসা রাখতে পারত, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে যদি নির্বাচন হত। শুধু হোমগার্ড নয়, রাজ্য পুলিশেরও একটা মাইনর অংশ সিপিএমের নির্দেশে চলছে না, তাদেরকে ট্রান্সফারও করে দিচ্ছে তারা, নন্দীগ্রামে অপারেশনের আগেও যেমন ট্রান্সফার করা হয়েছে, কিন্তু মেজরটাকে সিপিএম কন্ট্রোল করছে। সিপিএমের থ্রেট, সন্ত্রাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে এরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সেই অর্থে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফোর্স থাকলে এবং তারা কিছুটা সক্রিয় হলে মানুষ খানিকটা নিরাপত্তা বোধ করতে পারত।

**প্রশ্ন ঃ** আপানারা যে সিপিএম বিরোধী ঐক্যের কথা বলছেন, সেখানে আপনারা কংগ্রেসকে বাদ দেওয়ার কথা আগাগোড়া যেভাবে বলছেন, তাতে কি সি পি এমকে হারানো যাবে?

**উত্তর ঃ** আমাদের কাছে নির্বাচনী লড়াইটা প্রধান নয়। ভারতবর্ষের সমস্ত সংকটের মূল কারণ পুঁজিবাদ। এবং তার সাথে অ্যালায়েন্সে দাঁড়িয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদ। এদের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই। নির্বাচনকেও সেভাবেই আমরা গণ্য করি। কংগ্রেস এবং বিজেপি দুটিই জাতীয় বুর্জোয়া দল। মহাজোট যদি হত, মানে কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূল ঐক্য যদি হত, তবে অবশ্যই আমরা তার অংশীদার হতাম না। যেহেতু তৃণমূল তাদের সাথে সমদূরত্বের কথা ঘোষণা করেছে এবং তৃণমূল একটা আঞ্চলিক পার্টি, সেই জন্যই আমরা উদ্যোগী হয়ে তৃণমূলের সঙ্গে ঐক্য করেছি। আমরা সিপিএমের বিকল্প হিসাবে এখানে কংগ্রেস-বিজেপিকে জায়গা করে দেবো কেন? সিপিএম যা করছে তা তো কংগ্রেস-বিজেপিরই পলিসি, যা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে রচিত। অন্য রাজ্যে তারা যা করছে, এ রাজ্যে সিপিএম-ও তাই করছে। আমরা এখানে এম এল এ - এম পি বাড়াবার রাজনীতি তো করছি না। আমাদের কাছে আন্দোলনটাই বড় কথা। এম এল এ- এম পি-র জোরে তো নন্দীগ্রামের আন্দোলন হয়নি। জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তির ভিত্তিতে আন্দোলনের জোরেই বিজয় অর্জিত হয়েছে। আমরা যে প্রাইমারিতে ইংরেজি পুনঃপ্রবর্তন করতে সিপিএম সরকারকে বাধ্য করিয়েছি, সেটাও এম এল এ- এম পি, বা পঞ্চায়েত দিয়ে হয়নি, আন্দোলনের শক্তি এবং পাবলিক কমিটি করেই করেছি। ফলে জনগণের দাবি আদায়ে, পুঁজিবাদী শোষণ এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আক্রমণ মোকাবিলায় গণআন্দোলনই প্রথম এবং শেষ কথা। তার ভিত্তিতেই আমরা নির্বাচনকে দেখি। এবং এ কথাও আমরা মনে করি, তৃণমূল এবং আমরা যদি আন্দোলন করতে করতে গণকমিটি গড়ার মধ্য দিয়ে যেতাম, তাহলে কংগ্রেস-বিজেপির পিছনে যে পাবলিক আছে, তারাও এদিকে চলে আসত। কারণ পশ্চিমবঙ্গের জনগণ তো সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল এ কথা জেনেই যে, কংগ্রেস নেতৃত্ব সিপিএমের পিছনে আছে বা বিজেপিরও একই পলিসি, যেটা হল কৃষিজমি ধ্বংস করে স্পেশাল ইকনমিক জোন করা।

**প্রশ্ন ঃ** প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি বলেছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে কেরালার ধাঁচে ইউ ডি এফের মতো বামবিরোধী জোট গড়ে তুলতে চান। সে ব্যাপারে তাঁরা আপনাদের সাথে কথা বলবেন। এ ব্যাপারে আপনার কী প্রতিক্রিয়া?

**উত্তর ঃ** কংগ্রেস-বিজেপির সঙ্গে কোনও অ্যালায়েন্সে যাওয়ার প্রশ্ন আমাদের পক্ষে ওঠেই না। আমরা ফাইট করছি ভারতের বুর্জোয়া ক্লাসকে। এবং তার সাথে অ্যালায়েন্সে আছে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ। কংগ্রেস-বিজেপি তাদের রিপ্রেজেন্ট করছে।

**প্রশ্ন ঃ** তৃণমূল কি বুর্জোয়া ক্লাসের বিরুদ্ধে ফাইট করছে? কংগ্রেসের কর্মসূচি আর তৃণমূলের কর্মসূচির মধ্যে কি কোনও পার্থক্য আছে?

**উত্তর ঃ** আমাদের সাথে তৃণমূলের যে যৌথ ঘোষণা হয়েছে, যে সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল নেত্রীও ছিলেন, সেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে রচিত জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ৩৭ দফা দাবির ভিত্তিতে লড়াইয়ের কথাই বলা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, পঞ্চায়েত ভোটের পরে এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ভালোভাবে গড়ে উঠবে। আমরা উভয়ে জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

**প্রশ্ন ঃ** তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব আপনাদের আসন ছেড়ে দেওয়া সত্ত্বেও তৃণমূল প্রার্থী দাঁড়িয়ে গেছে। এ ব্যাপারে কি আপনারা তৃণমূল নেতৃত্বকে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিতে বলবেন ?

**উত্তর ঃ** ওদের দলের বিষয়ে আমরা বলতে যাব কেন ? মিডিয়ায় তো দেখছি, তৃণমূল নেতৃত্বই বলছেন, যারা নির্দেশ মানছে না, তাদের বিরুদ্ধে স্টেপস্ নেবেন।

**প্রশ্ন ঃ** ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি-র সঙ্গে আপনাদের যে কথা শুরু হয়েছিল, তা কি এখনও চলছে? তারা কি আসবে বলে মনে করছেন?

**উত্তর ঃ** ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি নেতারা আমাদের সাথে আলোচনায় যা বলেছিলেন, তার মূল কথা হচ্ছে, বহুদিন সরকারে থাকার ফলে তাঁদের দলের নিচুতলা এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছে যে, এখন বেরিয়ে আসা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এস ইউ সি আই তো সবসময়ই ওদের সাথে ঐক্যে আগ্রহী। আমাদের দরজা খোলাই রয়েছে।

উপস্থিত সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে কমরেড প্রভাস ঘোষ বক্তব্য শেষ করেন।

# ২৪ এপ্রিল জেলায় জেলায় সভা

সাতের পাতার পর

কাশীপুর, আদ্রা, রঘুনাথপুর এবং পারবেলিয়াতে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

**উত্তর ২৪ পরগণা**

২৪শে এপ্রিল এস ইউ সি আই উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বারাকপুর স্টেশন সংলগ্ন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শিল্পাঞ্চলের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা দলের প্রবীণ সংগঠক কমরেড কমল ভট্টাচার্য। প্রধান বক্তা ছিলেন, এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল। তিনি দীর্ঘ ভাষণে উল্লেখ করেন, কীভাবে শত শহীদের আত্মবলিদানের ফসল আমাদের দেশের স্বাধীনতা, দেশীয় পুঁজিপতিশ্রেণী আত্মসাৎ করল ; কীভাবে স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি এই পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে একটার পর একটা আইন এবং নীতি গ্রহণ করে পুঁজিবাদকে পুষ্ট করল এবং আজ এই নীতির ফলেই ভারতীয় পুঁজিবাদ একচেটিয়া ধনকুবের গোষ্ঠীর জন্ম দিয়ে আজ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে।

সভায় অসংখ্য সাধারণ মানুষ আগ্রহের সাথে দলের বক্তব্য শোনেন।

**কলকাতায় আইপিএল ক্রিকেট খেলায় ''চিয়ার লিডারস'' নামে অর্ধনগ্ন নারীদের কুৎসিত প্রদর্শনী বন্ধ করার দাবিতে ২৮ এপ্রিল ডি এস ও, ডি ওয়াই ও এবং এম এস এস-এর পক্ষ থেকে সি এ বি অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়**

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪, ২২৪৯১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in